ভক্তির জয়

হরিদাসের জীবন

শ্রীকালীপ্রসন্ন ঘোষ
প্রণীত।

ঢাকা-আরমাণিটোলা,
বান্ধব-কুটীর হইতে
শ্রীহরকুমার বসু কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

২৫ শে অগ্রহায়ণ, ১৩০৬।

উৎসর্গ।

যাঁহার প্রতিভাময় মধুর-আকৃতি
ও
প্রীতিস্নিগ্ধ মধুর-প্রকৃতি
পরকেও আপনার করিয়া লইত,
যিনি জ্ঞান-গৌরবে
বহুলোকের গুরুস্থানীয় হইয়াও,
ভক্তির স্বাভাবিক নম্রতায়
সকলের কাছেই নত রহিতে ভালবাসিতেন,
আমার সেই
পরমারাধ্য পিতামহদেব
স্বর্গগত
ঠাকুর প্রাণকৃষ্ণ ঘোষের
পবিত্র স্মৃতিতে
তদীয় আরাধনার ধন
দয়াময় দীনবন্ধুর
পদারবিন্দে
এই গ্রন্থ
ভক্তির সহিত
উৎসর্গীকৃত হইল।

প্রথম বারের বিজ্ঞাপন।

এই পুস্তকে ভক্তকবি বৃন্দাবনদাস-বিরচিত চৈতন্যভাগবত এবং পণ্ডিতবর কৃষ্ণদাস কবিরাজ-গোস্বামী-প্রণীত চৈতন্যচরিতামৃত নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থদ্বয় হইতে বহু কথা, প্রমাণার্থ, উদ্ধৃত হইয়াছে। যাহা ঠাকুর বৃন্দাবনদাসের লেখা, তাহার—চিহ্ন 'বৃ'। যাহা কৃষ্ণদাসের চরিতামৃত হইতে গ্রহণ করিয়াছি, তাহার সাঙ্কেতিক চিহ্ন 'কৃ' অথবা 'চ'। বৃন্দাবনদাস ও কৃষ্ণদাস উভয়েই, ভক্তিরসের বিমল-মধু-মুগ্ধ বিখ্যাত কবি, ভক্তের নিত্যসঙ্গী এবং বাঙ্গালা সাহিত্যের শিক্ষাগুরু। আমি ইঁহাদিগের উভয়েরই নিকট হৃদয়ের প্রীতি, ভক্তি ও কৃতজ্ঞতায় চিরজীবনের জন্য প্রণত রহিলাম।

বান্ধব-কুটীর—ঢাকা।
১৮ই শ্রাবণ, ১৩০২। } শ্রীকালীপ্রসন্ন ঘোষ।

দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপন।

ভক্তির জয় যখন প্রথম লিখিত হয়, তখন ঠাকুর হরিদাসের ভক্তি-লীলাত্মক বিচিত্র জীবনের বিকাশসম্পর্কে বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যে কোন পুস্তক ছিল না। থাকিলে আমি সে পুস্তকের সাহায্য গ্রহণ করিতাম। কিন্তু এক্ষণ জানিতে পাইয়াছি যে, আমার এই ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশিত হওয়ার পর, এই প্রসঙ্গে ৩। ৪ খানি উৎকৃষ্ট পুস্তক লিখিত হইয়াছে এবং সে সকল পুস্তকে হরিদাসের জীবন-সম্পর্কিত বহু কথা,

ঐতিহাসিক-বিজ্ঞতার সহিত আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ, এক্ষণ আমি চক্ষে ক্লিষ্ট এবং অধ্যয়নশ্রমে অপটু। সুতরাং সে সকল পুস্তকের সাহায্য গ্রহণ করা আমার পক্ষে এখন আর সম্ভব পর নহে। অপিচ, আমার এই পুস্তকের মুখ্য উদ্দেশ্য মানব-হৃদয়-নিহিত মহাভাবময়ী ভক্তির শক্তি প্রদর্শন। সুতরাং, প্রসঙ্গতঃ ইতিহাসের কথা লইয়া নানা কথার অবতারণা আমি তত আবশ্যক মনে করি নাই। হরিদাসের আশ্চর্য্য জীবন অবশ্যই বঙ্গীয় ইতিহাসের একটি বিশিষ্ট পরিচ্ছেদ। কিন্তু যে দেশের পুরাতন লেখকেরা কোন দিনও ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত অথবা ইতিহাসের গৌরব রক্ষার্থ যত্ন করেন নাই, সে দেশে, বহুকালের পর, পরস্পরবিরুদ্ধ বহুবিধ কথার পর্য্যালোচনা দ্বারা সত্য সংস্থাপন ও সামঞ্জস্যবিধান কিরূপ কঠোর কার্য্য তাহা সকলেই অনুমান করিতে পারেন। আমি এক্ষণ তাদৃক্ পর্য্যালোচনা ও পরিশ্রমের জন্য অযোগ্য। তথাপি এই সংস্করণে হরিদাসের ইতিহাস সম্পর্কিত নূতন-উত্থাপিত কোন কোন কথা লইয়া স্থানে স্থানে ফুট নোটে সামান্য একটুকু আলোচনা করিতে যত্নপর হইয়াছি। আমার পুস্তকের মুখ্য উদ্দেশ্য উল্লিখিত আলোচনা দ্বারা কোন অংশেও সমর্থিত হইয়াছে কি না, সহৃদয় পাঠক তাহার বিচার করিবেন।

বান্ধব-কুটীর—ঢাকা।
৩রা অগ্রহায়ণ, ১৩০৬।

শ্রীকালীপ্রসন্ন ঘোষ।

সূচীপত্র।

ভূমিকা

সমুদ্রে যেমন জলের উচ্ছ্বাস, সমাজে অথবা মানবজাতির সম্মিলিত-হৃদয়ে সেইরূপ ভাবের উচ্ছ্বাস। এ দুইয়ে কত-কটা সাদৃশ্য আছে। সমুদ্রে যখন জলের উচ্ছ্বাস হয়, তখন নিকটস্থ সমস্ত স্থান বন্যায় ডুবিয়া যায়। সমাজের সম্মি-লিত-হৃদয়ও যখন বিশেষ কোন ভাবের সাময়িক উচ্ছ্বাসে আন্দোলিত হইয়া উঠে, তখন দেশে বিপ্লব ঘটে। বিপ্লবেরই আর এক নাম যুগান্তর। কেন না, জাতীয় জীবনের যে অব-স্থাকে এখনকার লোকেরা বিপ্লব বলেন, পূর্ব্বতন আচার্য্যেরা তাহারেই যুগান্তর বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন। বিপ্লব ও বন্যা, বিজ্ঞানের চক্ষে, বিশ্বযন্ত্রের অনন্ত-বিস্তারিত অনন্ত-সূত্রে গ্রথিত অনুল্লঙ্ঘনীয় নিয়মের ফল; ভক্তির চক্ষে উভয়ই ভগবানের মঙ্গলময় লীলা।

এক শত বৎসরের কিছু অধিক হইল, ফরাশি ে
ঘোরতর বিপ্লব ঘটিয়াছিল। উহা সাধারণতঃ ফ
বিপ্লব বলিয়া পরিচিত। কিন্তু, সূক্ষ্মদর্শী পণ্ডিতদি
কেহ উহাকে সাম্যবিপ্লব এবং কেহ উহাকে শক্তিবি
থাকেন। কারণ, ঐ বিপ্লবের দ্বারা মানব-জগতে ই
মাণ হইয়াছিল যে, সমাজের বড় ছোট সকলেই এক
অধীন, সুতরাং এ অংশে সমান; এবং সমান হইয়া
যোচিত স্বাভাবিক শক্তির তার-তম্য অনুসারে, একে
অধীন, অতএব এ অংশে অসমান।

চারি শত বৎসরের কিছু কম হইল, আমাদিে
েশেও একটি মহাকোলাহলময় মনোমদ বিপ্লব শত
হৃদয়ে বিশেষ একটি মধুর ভাবের ঢেউ তুলিয়াছিল।
ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ীর নিকট ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত।
যাঁহারা সারগ্রাহী, তাঁহাদিগের বিবেচনায় উহা সর্ব্বথাই ভ
বিপ্লব বলিয়া অভিহিত হইবার যোগ্য। কারণ, উহা
পৃথিবীতে এ কথা প্রমাণিত হইয়াছিল যে, মনুষ্যের ক্ষু
তৃষ্ণা প্রভৃতি শারীরিক আকাঙ্ক্ষা ও জ্ঞান-লিপ্সা প্রভৃ
মনোবৃত্তি যেমন সত্য বস্তু, ভক্তি—অর্থাৎ ভগবানের পূর্ণান
ময় সঙ্গলাভের জন্য প্রাণের পিপাসাও—সেইরূপ একটি স
বস্তু, এবং সেই ভক্তির পথই মনুষ্যের প্রকৃত সুখ-শান্তি
চরমতৃপ্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও স্বভাব-সিদ্ধ সরল পথ।

এই পুস্তকে উল্লিখিত ভক্তিবিপ্লবেরই প্রাক্‌কালীন ইতিহাস হইতে কএকটি চিত্র আহরণ করিতে যত্নবান্ হইয়াছি; কোন অংশেও কৃতকার্য্য হইয়াছি কি না, তাহা হৃদয়িক পাঠকের বিচারাপেক্ষ।

এ স্থলে একটি কথা পরিস্কার করিয়া বলা প্রয়োজনসঙ্গত। মহাভারতের পরবর্ত্তী ভারতবর্ষ দুইটি মহাবিপ্লবের সাক্ষী। একটির নাম বৌদ্ধ-বিপ্লব, আর একটির নাম পৌরাণিক ধর্ম্ম-বিপ্লব। বৌদ্ধ তত্ত্বের দুই একটি কথা বাল্মীকির রামায়ণেও দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকে সে কথা গুলিরে প্রক্ষিপ্ত মনে করেন। আমি তাহা করি না। ফরাশি রাষ্ট্রবিপ্লবের সময়ে যে সকল কথার প্রচার-প্রসঙ্গে পণ্ডিত ও অপণ্ডিত সকলই একবারে পাগলের মত নৃত্য ও আস্ফালন করিয়াছিল, সাম্য-নীতির সে সকল প্রাণ-স্পর্শিনী অথবা প্রাণ-পীড়নী কথা পাঁচ পুরুষ পূর্ব্বেও লোকে দুই চারিটি সাধারণ মনস্বীর মুখে অকস্মাৎ শুনিতে পাইয়া বিস্মিত হইয়াছে। বৌদ্ধ তত্ত্বের কোন কোন কথাও এই প্রকারেই পূর্ব্বতন ঋষিদিগের মুখে এখানে সেখানে ফুটিয়া থাকিবে। তাহা কোন অংশেও অসম্ভব নহে। কিন্তু যাহা এই পৃথিবীতে বৌদ্ধধর্ম্ম বলিয়া পরিচিত তাহার প্রতিষ্ঠাতা ও প্রবর্ত্তক বুদ্ধদেব—শাক্যসিংহ এবং শাক্যসিংহের মত ও উপদেশ প্রচার উপলক্ষে ভারতবর্ষে যে ভয়ঙ্কর আন্দোলন উপস্থিত

হয়, তাহারই নাম বৌদ্ধ-বিপ্লব। শান্তি-প্রিয় বুদ্ধ
স্বতঃই বিপ্লবের বিরোধী ছিলেন। কিন্তু তদীয়
প্রাপ্তির পর, তাঁহার সে অহিংসার ধর্ম্মই কিরূপ
বিপ্লবের স্রোতে প্রবাহিত হইয়াছিল, সকলেই তা
আছেন। পৌরাণিক ধর্ম্ম-বিপ্লব উহারই প্রতিঘাতি
উহা ঠিক্ কোন্ সময়ে প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়, তাহা
না। তবে ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে,
গীতা, বিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্‌ভাগবত প্রভৃতি জগদ্দুল্ল
গ্রন্থনিচয় ঐ সময়েই আনন্দময়ী আকাশ-বাণীর ন্য
নীন্তন ভারতবর্ষের আশাশূন্য হৃদয়কে প্রথম আকর্ষ
এবং সে আকাশ-বাণীর সার-সিদ্ধান্ত অর্থাৎ ভক্তি
শঙ্করাচার্য্যের সময় ভারতের সকল দিকেই জয় জয়
হলে বিঘোষিত হইতে থাকে। ইহা বলিয়া দেও
বশ্যক যে, পৌরাণিক ধর্ম্মের আদ্যোপান্ত সমস্তই
ভক্তির কথা; এবং বঙ্গের ভক্তিবিপ্লবও তাহারই এক
তরঙ্গ। কিন্তু আমি সে তরঙ্গকে ইতিহাসের এক
পরিচ্ছেদ রূপে পৃথক্ করিয়া লইয়াছি।

ভক্তির জয়

অথবা

হরিদাসের জীবন-যজ্ঞ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

চন্দ্রোদয়ের পূর্ব্বে।

কৃষ্ণপক্ষের একাদশী। রাত্রি যতই গভীর হইতেছে, পৃথিবী ততই গাঢ় ও গভীর অন্ধকারে আচ্ছাদিত হইয়া, ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করিতেছে। তাহাতে আবার আকাশের স্থানে স্থানে নিবিড়-কৃষ্ণ মেঘের ছায়া। উত্তর দক্ষিণ, পূর্ব্ব পশ্চিম, সকল দিকেই সমান অন্ধকার। উপরে ও নীচে, সমস্তই অন্ধকারে সমান ঢাকা। আকাশের এদিকে ওদিকে যতকগুলি নক্ষত্র, মেঘের আবরণ ভেদ করিয়াও, মিটি মিটি জ্বলিতেছিল। সে গুলিও মেঘে লুকাইল। পৃথিবী প্রকৃতই ঘন অন্ধকারের অতল ও অপার সমুদ্রে ডুবিয়া গেল।

পৃথিবী জড়পিণ্ড হইলেও, জীব জন্তুর কোলাহলে সতত কোলাহলময়ী। পৃথিবীর আলো যেমন আঁধারে ডুবিয়াছে, পৃথিবীর সে কোলাহলও এইক্ষণ যেন কেমন এক নিস্তব্ধতার

মধ্যে ডুবিয়া রহিয়াছে। মাঝে মাঝে, কুররী প্রভৃতি কো কোন পক্ষীর অহ হ শব্দ মানুষের কানে * পশিতেছে কিন্তু, সে শব্দ বড়ই শোক-সূচক এবং যার পর নাই ভয়াবহ শুনিলেই প্রাণ শুকাইয়া যায়, শরীর শিহরিয়া উঠে। মনে হয়, পৃথিবীতে কে যেন পাপের প্রলোভনে পড়িয়া, এই অন্ধকারের আবরণে, কোথায় কার বুকে ছুরি বসাইতেছে, অথবা কোন অসহায় ব্যক্তির সর্ব্বনাশ করিতেছে, এবং পৃথিবী সে পাপের বোঝা সহিতে না পারিয়া, কুররীর ঐ রূপ হৃদয়বিদারী করুণশব্দে, প্রহরে প্রহরে বিলাপ করিতেছে।

এই নিস্তব্ধ অন্ধকারের মধ্যে তরল সোনার * সুখ-শীতল আভার মত কেমন একখানি স্নিগ্ধ-শীতল মধুর আভা, আকাশের পূর্ব্বপ্রান্তে, ধীরে ধীরে ফুটিতে লাগিল, এবং যে পৃথিবীকে এতক্ষণ দুঃখের প্রতিমূর্ত্তি জ্ঞানে বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছিলাম, সেই পৃথিবীরই অধরপ্রান্তে কেমন একখানি অতিমধুর হাসির রেখা প্রতিভাত হইল। বুঝি পৃথিবী চন্দ্রোদয়ের পূর্ব্বাভাস দেখিয়া, প্রাণের আনন্দে, প্রীতি প্রফুল্ল-নয়নে, সে অপরূপ শোভা চাহিয়া দেখিল। দয়েল ঘুমে অচেতনের মত ছিল। তাহার ঘুম ভাঙ্গিল। দয়েলের সঙ্গে আরও দুই একটি শোভাবিলাসী বন-বিহঙ্গ জ্যোৎস্না

* নিমিত্তাভাবে নৈমিত্তিকস্যাভাবঃ। ণত্বের নিমিত্ত রকার-শ্রুতির অভাবে কাণ ও সোণা এই দুই বাঙ্গালা শব্দে দন্ত্য নকার ব্যবহার্য্য।

দেখিয়া জাগিল, এবং তাহারা এইক্ষণ, যেন পৃথিবীরই অভি-নব আনন্দে, তাহাদিগের সে ঘুমন্তপ্রাণে—ঘুমন্তকণ্ঠে—দুই এক বার ডাকিল। কৃষ্ণা একাদশীর কান্তমূর্ত্তি কমনীয় চন্দ্র এখনতকও প্রস্ফুটিত হয় নাই। কিন্তু তথাপি পৃথিবীর সে অন্ধকারময় মুখচ্ছবির এক ধারে আনন্দের একটি সূক্ষ্ম—সুন্দর, বিচিত্র রেখা পড়িল।

জড়জগতে যেমন অন্ধকার রাত্রিতে, চন্দ্রোদয়ের পূর্ব্ব-ক্ষণে, জ্যোৎস্নার এইরূপ সুখ-সৌন্দর্য্যময় পূর্ব্বাভাস দেখিতে পাইয়া জীবজন্তু প্রীতিতে উৎফুল্ল হয়, মানব-জগতেও সেই-রূপ অসত্য ও অধর্ম্ম—অথবা অবিচার ও অত্যাচারের আতঙ্ক-জনক অন্ধকারের মধ্যে, জ্ঞান, ধর্ম্ম অথবা প্রেমভক্তি প্রভৃতি বিশেষ কোন মহাবস্তুর অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে মনুষ্য, ঐরূপ এক-খানি সুখ-সুন্দর শীতল আলোকের পূর্ব্বাভাস প্রত্যক্ষ করিয়া, পুলকিত হইয়া থাকে। সে অস্ফুট অথবা অর্দ্ধস্ফুট স্নিগ্ধ আলোককে জ্ঞান, ধর্ম্ম অথবা প্রেমভক্তির পূর্ব্বাভাস বলিয়া [illegible]শ করিলে অসঙ্গত হয় না।

আমাদিগের এই বঙ্গভূমিও একবার জ্যোৎস্নার আগে জ্যোৎস্নার ঐরূপ পূর্ব্বাভাস দেখিয়াছিল। বঙ্গদেশ, ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ন্যায়, যবন রাজাদিগের * বহুকালব্যাপী

* যবন শব্দ সংস্কৃতমূলক ও জাতিবাচক; বিদ্বেষ-প্রকাশক নহে। [illegible]তন আর্য্যেরা সিন্ধুনদের পশ্চিমবর্ত্তী পারসীক ও আরব প্রভৃতি

ভয়ঙ্কর অত্যাচারে জীবন্মৃতবৎ পড়িয়া রহিয়াছে,—দেবালয়ের দেউটি নিবিয়াছে, দেববিগ্রহ ধূলায় লুণ্ঠিত কিংবা দস্যুর পদ-তলে দলিত হইতেছে,—লোকে দেখিয়া শুনিয়া নাস্তিকের ন্যায় নিরাশ হইয়া, নিকৃষ্ট সুখসম্মানের নিকৃষ্ট লোভে স্বধর্ম্মের শান্তিনিকেতন ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছে,—শাস্ত্রের পটলে পটলে সময়ের উপযোগী অলীক কথা ভরিয়া ভরিয়া কখনও আপনার প্রয়োজন সাধন, কখনও বা যবনের প্রীতিবর্দ্ধন করিতেছে,—এবং জীবন্ত ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া ও ধর্ম্মের প্রাণ-রস-স্বরূপ ভক্তির অমৃতে উপেক্ষা দেখাইয়া, ধার্ম্মিকতার বহিরাবরণে তনু ঢাকিতেছে,—ধর্ম্মের নামে একে অন্যের বুকের রক্ত শুষিতেছে,—ঠিক এমনই সময়ে, এই হতভাগ্য বঙ্গের অধিবাসীরা, যেন চন্দ্রোদয়ের একটুকু পূর্ব্বে, চন্দ্রকান্তিরই চারুরেখা দেখিতে পাইয়া, সে নীরস-নিঠুর নৈরাশ্যের অন্ধকারেও একবার চকোরের তৃষিতপ্রাণে চক্ষু মেলিয়া চাহিয়াছিল।

যখন প্রেমভক্তির প্রত্যক্ষ অবতার শ্রীগৌরাঙ্গ,—সেই সোনার পুতুল অথবা সোনার মানুষ, চন্দ্রের প্রফুল্লকান্তিতে বঙ্গের একপ্রান্তে প্রস্ফুট হইয়া, ভারতে প্রেম ও ভক্তির

বহু জাতিকে যবন বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন। মুসলমান ধর্ম্মের প্রচা অবধি যবন আর মুসলমান প্রায় একার্থবোধক শব্দ।

অনন্তবাহিনী অমৃতধারা ঢালিয়া দেন, * তখন ভারতবর্ষে কেমন একটা যুগান্তর ঘটিয়াছিল, তাহা অনেকেই শুনিয়াছেন। গৌরাঙ্গের সে অলৌকিক ও আনন্দময় ইতিহাস এ ক্ষুদ্র গ্রন্থের বিষয় নহে। তখন অন্ধ, যেন হৃদয়ে কি

---

* শ্রীগৌরাঙ্গ ১৪০৭ শকাব্দে—(অর্থাৎ ১৪৮৫ খৃঃ অব্দে)—নবদ্বীপ নগরে জন্ম গ্রহণ করেন; এবং ২১ বৎসরকাল অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় নিবিষ্ট রহিয়া ২২ বৎসর বয়সের সময়ে, আগে বঙ্গে তার পর ভারতে, প্রেম ও ভক্তির ধর্ম্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হন। তাঁহার বয়স যখন ২৪ বৎসর তখন তিনি, কাঁটোয়া নগরে, কেশব ভারতীর নিকটে সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষিত ও কৃষ্ণচৈতন্য নামে অভিহিত হইয়া, নীলাচলের দিকে চলিয়া যান। তাঁহার পিতার নাম জগন্নাথ মিশ্র, মাতার নাম শচী। তাঁহার অলৌকিক জীবনবৃত্তান্ত চৈতন্যচরিতামৃত নামক প্রামাণিক বৈষ্ণবগ্রন্থে নিম্নলিখিতরূপে অতি সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। যথা,——

"শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নবদ্বীপে অবতরি; অষ্ট চল্লিশ বৎসর প্রকট বিহারী।—চৌদ্দশত সাত শকে জন্মের প্রমাণ; চৌদ্দশত পঞ্চান্নে হৈলা অন্তর্ধান।—চব্বিশ বৎসর প্রভু কৈল গৃহ-ব্যাস; নিরন্তর কৈল তাহে কীর্ত্তন বিলাস।—চব্বিশ বৎসর শেষে করিয়া সন্ন্যাস; চব্বিশ বৎসর কৈল নীলাচলে বাস।—তার মধ্যে ছয় বৎসর গমনাগমন; কভু দক্ষিণ, কভু গৌড়, কভু বৃন্দাবন।—অষ্টাদশ বৎসর রহিলা নীলাচলে; কৃষ্ণপ্রেম নামামৃতে ভাসাইল সকলে।"

আলোকে কি দেখিতে পাইয়া, মনুষ্যকে জীবনের পথ দেখাইয়াছিল ;—বধির, যেন কানে কার কি মধুমাখা নাম শুনিয়া, মনের আকুলতায় কাঁদিয়াছিল ;—বোবার মুখে কথা ফুটিয়াছিল,—যে ব্যক্তি কোন দিন কোন কথা কহিতে জানিত না, সেও শত সহস্র পিপাসু দুঃখীকে তাহার প্রাণের কথা বুঝাইয়া দিয়া, নয়নজলে ভাসাইয়াছিল। তখন ভারতবর্ষের নানা স্থানে, পাষাণ-কঠোর পাপাত্মারাও, কি এক ভাবে উন্মাদিত হইয়া, দেবতার শক্তি ও দেবতার সুকোমল সৌন্দর্য্য লাভ করিয়াছিল, এবং যে তাঁহার আকর্ষণে পড়িয়াছিল, সেই, প্রাণের টানে তাঁহার পায়ে গড়াইয়া পড়িয়া, সর্ব্বাংশে দেবতুল্য হইয়াছিল।

বস্তুতঃ, গৌরাঙ্গ, কি রূপে একে এক সহস্র হইয়া, এ দেশের অসংখ্য পাষাণ-কঠিন নিরাশ প্রাণ তাঁহার প্রেমময় প্রাণে টানিয়া লইয়াছিলেন ; তিনি কি রূপে, কি মোহন-মন্ত্রে, পণ্ডিত ও মূর্খ, পুণ্যাত্মা ও পাপিষ্ঠ, ধনী ও দরিদ্র, ব্রাহ্মণ ও চণ্ডাল, কুলীন ও কুলাঙ্গার, যোগী ও ভোগী, সন্ন্যাসী ও বিলাসী এবং গৃহী ও বনবাসীকে হরিনামের কীর্ত্তনানন্দে একত্র মিলাইয়া, এক নামে ভুলাইয়া, একভাবে ও এক রসে ঢলাইয়া, এক সূতায় গাঁথিয়াছিলেন ; ভীরুর প্রাণে সিংহের ভৈরবশক্তি ও নিষ্ঠুরের হৃদয়ে দয়ার সঞ্চারণ করিয়া মানুষের বিস্ময় জন্মাইয়াছিলেন ; কি

রূপে তিনি একা এক কোটি ভিন্নমতি ও বিভিন্নগতি মনু-ষ্যের প্রাণে প্রাণের ঠাকুররূপে পূজা পাইয়াছিলেন, তাহা সহজে বুঝান যাইতে পারে না, এবং আমি এইক্ষণ সে প্রসঙ্গের কোন কথা তুলিব না। সে সময়ে ভারতের হৃদয়সমুদ্র চন্দ্রোদয়ে উচ্ছ্বসিত হইয়াছে, গাঙে নূতন জোয়ার বহিয়াছে, —চারিদিকে আনন্দের কোলাহল উঠিয়াছে। সে অভাবনীয় ইতিবৃত্তের অনেক ঘটনাই মনোবুদ্ধির অগম্য, এবং তাহা অল্প কথায় পরিব্যক্ত করা অসম্ভব।

কিন্তু, গৌরচন্দ্রের প্রকৃত অভ্যুদয়ের কিছুকাল পূর্ব্বে—গৌরাঙ্গ যখন চারিদিকের মোহময় অন্ধকারের মধ্যে কৃষ্ণ-পক্ষীয় একাদশীর চন্দ্ররেখার ন্যায় মাতৃক্রোড়ে প্রমুদিত মাত্র,* সেই সময়ের একটুকু আগে—বিশ্ববিধাতার কেমন এক বিচিত্র নিয়মে, আমাদিগের এ দেশে, ভক্তির পূর্ব্বাভাসের মত একটি অপূর্ব্ব অবস্থা ঘটিয়াছিল, এবং তখনকার সে আঁধারমাখা আলোকেও অসংখ্য নর নারী, ভক্তির অমৃত-ময়ী জয়শ্রী অবলোকন করিয়া, আশায় ঊর্দ্ধমুখে তাকাইয়া-

---

* যাঁহারা বঙ্গীয় বৈষ্ণবাচার্য্য ও বৈষ্ণবকবিদিগের গ্রন্থপত্র পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা ইহা বিশিষ্টরূপে জানেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার জন্মসময়ে তদীয় অলৌকিক রূপে বহু হৃদয় আকর্ষণ করিয়া, কিছু দিনের তরে, ধীরে ধীরে, আঁধারে ডুবিয়াছিলেন।

ছিল। যেন এ দুঃখদগ্ধ দুঃখান্ধ দেশে কি একটা নূতন আলোর প্রবাহ আসিয়া পৌহুঁছিতেছে, ইহা হৃদয়ে অনুভব করিয়া, অসংখ্য লোক আঁখি মেলিয়াছিল। দুই চারিটি ভক্ত, যেন প্রাণে কি বুঝিয়া, ভক্তির বিজয়-সঙ্গীত গাইয়াছিল। তাহাদিগের প্রাণে প্রাণে তাড়িতের একটা তরঙ্গ ছুটিয়াছিল। বঙ্গীয় ইতিহাসের সে মধুর কাহিনী শুনিতে পাঠকের ইচ্ছা হইবে কি?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

নবদ্বীপে—বঙ্গের রাজধানী।

আমি যে সময়ের ইতিবৃত্ত কহিতে যাইতেছি, সে আজি প্রায় সাড়ে চারি শত বৎসরের কথা। কিন্তু তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী সময়েরও কিছু কিছু বৃত্তান্ত, এখানে প্রসঙ্গ-সঙ্গতির অনুরোধে, সামান্যতঃ উল্লেখ করা আবশ্যক হইয়াছে। কারণ, বঙ্গের রাজধানী কি রূপে যবনের গ্রাসে পড়িল, এবং যবন রাজপুরুষেরা পরিশেষে বঙ্গদেশে কি রূপ ভয়ঙ্কর পরাক্রান্ত হইয়া উঠিলেন, সে কথার সহিত এই গ্রন্থের মুখ্য কথার প্রকৃতই নানা সূত্রে সম্পর্ক আছে।

বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ সমাজের কুল-ব্যবস্থাপক, চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রবীর, মহারাজাধিরাজ বল্লালসেন বাঙ্গালিমাত্রেরই কাছে সুপরিচিত। বল্লাল ১০৬৬ খৃঃ অব্দে বঙ্গের সিংহাসনে আরোহণ করেন, এবং ৪১ বৎসর কাল স্বাধীন অধীশ্বররূপে রাজত্ব করিয়া, ১১০৬ খৃঃ অব্দে লোকান্তর প্রাপ্ত হন। বল্লালের পুত্র লক্ষ্মণ। লক্ষ্মণসেন বঙ্গীয় সেন রাজাদিগের মধ্যে বিখ্যাতনামা লোক। তাঁহার সময়ে মিথিলা—(বর্ত্তমান ত্রিহুত)—প্রদেশও বঙ্গের অধিকার-ভুক্ত ছিল; এবং বারানসী, প্রয়াগ ও শ্রীক্ষেত্র প্রভৃতি দূরবর্ত্তি স্থানসমূহেও তাঁহার বিজয়স্তম্ভ সংস্থাপিত হইয়াছিল। তিনি তাঁহার নিজ নামে মিথিলায় একটি অব্দ প্রচলন করিয়াছিলেন। সে অব্দের

নাম লক্ষ্মণ সংবৎ। উহার ব্যবহার-চিহ্ন লং সং অথবা লসং। মিথিলার অনেক স্থলে এখনও উহার প্রচলন আছে। পণ্ডিত-প্রিয় লক্ষ্মণ, পিতার স্নেহে প্রস্ফুট বাল্যে বহু শাস্ত্রে সুশিক্ষিত, এবং প্রথমযৌবনে যুবরাজের পদ-সম্পর্কেই রাজ্য-শাসনের সকল কার্য্যে সুদীক্ষিত হইয়া, পিতৃবিয়োগের পরও. সম্ভবতঃ সতর * আঠার বৎসর জীবিত ছিলেন। তিনি যখন যুবরাজ নামেই দেশের রাজা, সেই সময় হইতেই ব্রাহ্মণ-সর্ব্বস্ব নামক গ্রন্থপ্রণেতা বিখ্যাত পণ্ডিত হলায়ুধ রাজ-পণ্ডিত রূপে তাঁহার প্রিয় সহচর, এবং তিনি যে কালে স্বয়ং কর্ত্তৃত্বে সিংহাসনে অধিরূঢ়, তখনও হলায়ুধই রাজমন্ত্রিরূপে তাঁহার প্রধান সুহৃৎ।

লক্ষ্মণের দুই পুত্র ; জ্যেষ্ঠ মাধব, কনিষ্ঠ কেশব। মাধব

* আবুল ফজল বলেন যে, লক্ষ্মণসেন আট বৎসর মাত্র রাজত্ব করিয়াছেন। এ কথা নিতান্তই অপ্রামাণিক। সুবিখ্যাত পণ্ডিত রাজেন্দ্র-লাল মিত্র অনুমান করেন যে, লক্ষ্মণসেন সম্ভবতঃ ত্রিশ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়া থাকিবেন। ইহাও আমার নিকট একটু বেশী বোধ হয়। আমি আমার সামান্য সংগ্রহে যত দূর সন্ধান পাইতেছি, তাহাতে লক্ষ্মণসেনের স্বাধীন রাজত্ব সতর বৎসরের কম এবং আঠার বৎসরের অধিক হওয়া কোন ক্রমেই সম্ভবপর হয় না। লক্ষ্মণসেন যখন সিংহাসনে অধিরোহণ করেন, তখন তাঁহার বয়স অতি কম হইলেও চল্লিশ। চল্লিশের পর আঠার বৎসর নিতান্ত অল্প সময় নহে।

রাজ্যাধিকার পাইয়াছিলেন কি না, তাহা সংশয়ের বিষয়। যদি পাইয়া থাকেন, সে অতি অল্পকালের জন্য। তদীয় অনুজ কেশবসেন, তিন বৎসর * রাজত্ব করিয়া, ১১২৪ খৃঃ অব্দে পরলোকে গমন করেন, এবং তাঁহার পরলোক-গমনের অল্প কিছু দিন পরে, অর্থাৎ ঐ ১১২৪ খৃঃ অব্দের শেষ ভাগে, বঙ্গের শেষ হিন্দু রাজা, বল্লালের প্রপৌত্র লাক্ষ্মণেয়সেন †

* লক্ষ্মণসেনের দ্বিতীয় পুত্র কেশবসেন বসুদেবীর গর্ভজাত। তিনি যে তিন বৎসর কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার দানপত্র দ্বারা সুন্দররূপে প্রমাণিত রহিয়াছে।

† লাক্ষ্মণেয়সেনের আরও তিনটি নাম ছিল ; সুষেণ, শূরসেন ও অশোকসেন। হিন্দুর মধ্যে এক জনের এই রূপ বহু নাম থাকা চির-প্রচলিত। অনেকেরই এই রূপ সংস্কার যে, লক্ষ্মণসেন আর লাক্ষ্মণেয় এক ব্যক্তি। ইহা অসম্ভব। লক্ষ্মণসেন যে ১১০৬ খৃঃ অব্দে সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন, সে বিষয়ে সংশয় হইতে পারে না। যদি তিনিই বঙ্গের শেষ হিন্দু রাজা হন, তাহা হইলে, ঐ ১১০৬ খৃঃ অব্দ হইতে ১২০৪ খৃঃ অব্দ—(অর্থাৎ রাজ্যপ্রাপ্তির সময় হইতে রাজ্যচ্যুতির সময়)—৯৯ বৎসর হইয়া পড়ে। তা ছাড়া, আর এক কথা রহিয়াছে। বিশ্রুতনামা লক্ষ্মণসেন যে প্রৌঢ়যৌবনে সিংহাসনে উঠিয়া ছিলেন, তাহা তৎপ্রণীত বিবিধ কবিতা, তদীয় সুপ্রসিদ্ধ মন্ত্রী পণ্ডিতপ্রবর হলায়ুধ প্রণীত ব্রাহ্মণ-সর্বস্বের লেখা, এবং তাঁহার দানপত্রাদি দ্বারা সুচারুরূপে প্রমাণিত। যদি সিংহাসনে আরোহণের সময় তাঁহার বয়স চল্লিশ বৎসর থাকা অনুমান করিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে রাজ্যত্যাগের সময় তাঁহার

জন্ম গ্রহণ করিয়া, জন্ম-মুহূর্ত্তের পরক্ষণ হইতেই বঙ্গের রাজাধিরাজ নামে রাজ্যের সর্ব্বত্র বিঘোষিত হন।

বল্লালের পৈত্রিক ও পুরাতন রাজধানী * বিক্রমপুর।

বয়স ৪০+৯৯=(১৩৯) একশত উনচল্লিশ বৎসর! অপিচ, তব্‌কাৎ-ই-নাসিরী প্রণেতা মিন্‌হাজ্‌উদ্দীন, ভক্‌তিয়ার কর্ত্তৃক বঙ্গবিজয়ের অল্প কিছু দিন পরেই, গৌড়ে আসিয়াছিলেন। তিনি রাজ্যচ্যুত লাক্ষণেয়-সেন সম্পর্কে যে সকল কথা লিখিয়াছেন, তাহার অনেক অংশই সত্য। তাঁহার লেখা অনুসারে লাক্ষণেয় ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্রই বঙ্গের রাজা; সুতরাং, তখন পিতৃহীন। কিন্তু, বল্লালের পুত্র লক্ষ্মণ পিতার আজ্ঞাধীন রূপে সুদীর্ঘকাল যৌবরাজ্য ভোগ করিয়া পরিণত বয়সে রাজা হন। লক্ষ্মণসেনের পুত্র মাধব আর কেশব রাজত্বকালে প্রতিপত্তি লাভ করিবার সময় পান নাই, এবং এই হেতু, ইতিহাসে তাঁহাদিগের তেমন নাম নাই। আমি যত দূর বুঝিতেছি, তাহাতে ইহাই নিশ্চিত যে, মাধব আর কেশব সর্ব্বত্র সুপরিচিত না হইয়া পর-লোক-গত হওয়াতেই, লক্ষ্মণ আর লাক্ষণেয়, অর্থাৎ পিতামহ ও পৌত্র, অনেকের কাছে এক ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত।

* মাননীয় ডক্টর রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতে, দাক্ষিণাত্য হইতে সমাগত এবং পূর্ব্ববঙ্গে প্রথম উপনিবিষ্ট, ক্ষত্রবংশোদ্ভব সেন রাজাদিগের প্রথম ও প্রধান রাজধানী ঢাকার নিকটে বিক্রমপুর। "The chief seat of their power was at Vikrampur near Dhaka, where the ruins of Ballal's palace are still shown to travellers." মিত্র মহাশয়, তাঁহার এ কথার সমর্থনের জন্য, পুরাতনতত্ত্বসমালোচক

বিক্রমপুরের অন্তর্গত চিরপরিচিত রামপাল গ্রামে অদ্যাপি লোকে সে রাজধানীর বিবিধ চিহ্ন ও বল্লালের সুবিস্তৃত দীঘী ও পরিখা প্রভৃতি দর্শনের জন্য গমন করে;—আর বল্লালের পূর্ব্বপুরুষগণ, ঐ গ্রামের কোন্ স্থানে পুত্রেষ্টি যজ্ঞের অনুষ্ঠানে

ডক্টর ওয়াইজের লেখাকেও প্রামাণিক জ্ঞানে সম্মান করিয়াছেন। ডক্টর ওয়াইজ বলেন,—"A remarkable evidence of this is afforded by the names of the 56 villages assigned to the discendants of the five Brahmans whom Adishur brought from Kanauj. All those villages were situated within the delta, and none out of it." রাজেন্দ্রলালের উল্লিখিত সিদ্ধান্ত সর্ব্বতোভাবেই সুসঙ্গত। কারণ, সেনবংশীয়েরা যখন বঙ্গদেশে প্রথম বাসগ্রহণ করেন, তখন বঙ্গের পশ্চিম ও উত্তর ভাগে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী পাল রাজারা অতি প্রবল। এ সকল প্রমাণের উপর আর একটি কথাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহা সকলেই জানেন যে, বঙ্গীয় সেন রাজা-দিগের আদিপুরুষ প্রসিদ্ধনামা বীরসেন অথবা আদিশূর কান্যকুব্জাগত পঞ্চ ব্রাহ্মণকে পাঁচখানি গ্রাম প্রদান করিয়া পূজা করিয়াছিলেন। সেই পঞ্চ গ্রাম অদ্যাপি বিক্রমপুরের পূর্ব্বদক্ষিণভাগে পাঁচগাঁ নামে বিদ্যমান রহিয়াছে, এবং সেখানে এখনও বহুসংখ্য কুলীন ব্রাহ্মণের বাস্তগৃহ আছে। ঐ পাঁচগাঁই যে আদিশূরের প্রদত্ত "পাঁচ গ্রাম" তাহা তত্রত্য অধিবাসীরাও পুরুষপরম্পরাক্রমে শুনিয়া আসিতেছেন। পাঁচ-গাঁয়ে এখনও ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কোন বর্ণের প্রভুত্ব নাই, এবং সেখান-কার ছোট বড় সমস্ত ব্রাহ্মণই অশূদ্রপ্রতিগ্রাহী।

পঞ্চ ব্রাহ্মণের পূজা করিয়াছিলেন, এবং বল্লালই বা কোথায় কি স্মরণীয় কার্য্য সম্পাদন করিয়া, সমাজে চিরস্মরণীয় হইয়াছেন, তাহা বড় বড় গাছের ছায়ায় বসিয়া, উপন্যাসপটু বৃদ্ধদিগের মুখে শুনিয়া থাকে।

বল্লালের দ্বিতীয় রাজধানী গৌড় নগর। মুর্শিদাবাদের উত্তরে মালদহের জেলায় মহানন্দা নদীর পূর্ব্বতটে, এবং কালিন্দী—গঙ্গার উত্তরে, পুণ্ড্র নামক একটি প্রসিদ্ধ নগর ছিল। বঙ্গদেশের পালবংশীয় বৌদ্ধ রাজারা যখন ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র বিশেষ সম্মানিত, তখন ঐ পুণ্ড্র নগর তাঁহাদিগের রাজধানী। পালবংশীয়েরা, তাহার পর, পুণ্ড্রের বহু দক্ষিণে, গঙ্গার পূর্ব্বতটে, আর এক রাজধানী স্থাপন করেন, তাহার নাম গৌড়। পালদিগের সে পুণ্ড্রনগর, এইক্ষণ পাঁড়ুয়ার জঙ্গলে পরিণত হইয়া, পরিব্রাজকদিগের কাছে বঙ্গের বিলুপ্তকীর্ত্তির কাহিনী কহিতেছে, এবং সে গঙ্গা-সলিল-সিক্ত, জন-কোলাহল-পূর্ণ গৌড় নগরের পত্তনভূমিও এইক্ষণ, পাণ্ডবের ইন্দ্রপ্রস্থের ন্যায়, মুখে বিষাদের কালিমা মাখিয়া, বন্যজন্তুর বাসভূমি হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু, এক সময়ে সেই পুণ্ড্র নগরের উত্তরপ্রান্ত হইতে গৌড়ের দক্ষিণ প্রান্তরেখা পর্য্যন্ত সমস্ত স্থান, দেবভোগ্য অমরাবতীর ন্যায়, সকলেরই স্পৃহণীয় ছিল। বোধ হয়, এই হেতু এবং বৌদ্ধের রাজধানীতে হিন্দুর দেব-বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠারূপ অতুলকীর্ত্তির

অভিলাষেই কীর্ত্তিলিপ্সু বল্লাল, গৌড় নগরে * এক অভিনব রাজধানী সংস্থাপন করিয়া, তাঁহার প্রিয়তম পুত্র লক্ষ্মণসেনের পরিচয়ে উহাকে লক্ষ্মণাবতী নামে অভিহিত করাইলেন ;—অপিচ বঙ্গীয় পণ্ডিতদিগের সহিত প্রীতি ও শ্রদ্ধার সূত্রে একটুকু বেশী জড়িত হইয়া, সমাজে অধিকতর প্রতিপত্তি লাভের উদ্দেশ্যে, গঙ্গা ও জলঙ্গীর সঙ্গমস্থানে—নবদ্বীপ নগরে—আর এক নূতন প্রাসাদ প্রতিষ্ঠা করিলেন। তিনি তাঁহার এই তিন রাজধানীর মধ্যে, যখন যেখানে প্রবৃত্তি অথবা প্রয়োজন, তখন সেইখানে অবস্থান করিতেন এবং যত দূর জানা যাইতেছে, তাহাতে বোধ হয়, বয়সের শেষ সময়ে, নবদ্বীপের রাজধানীতে পণ্ডিতদিগকে লইয়া শাস্ত্রালোচনে সময়-যাপন করিতেই বেশী ভালবাসিতেন।

এই সময় হইতেই নবদ্বীপে রাজলক্ষ্মীর বিশেষ কৃপা। কিন্তু, যখন লাক্ষ্মণেয় সিংহাসনে অধিরূঢ়, তখন নবদ্বীপই বঙ্গের সর্ব্বপ্রধান নগর। লাক্ষ্মণেয়সেনের পিতামহ লক্ষ্মণ-

---

* পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত হণ্টর সাহেবের বিবেচনায়, ঐতিহাসিক সময়ের গণনায়, আগে গৌড়, তার পর পুণ্ড্র অথবা পাণ্ডুয়া। "Gaur was the earlier of the two capitals, and in historical associations and in size by far the more important." হণ্টর সাহেবের এ অনুমান প্রমাণবিরুদ্ধ। কারণ, যে কালে গৌড় নগরের সৃষ্টি হয় নাই, সে কালেও পুণ্ড্র নগরে পুরাতন পৌণ্ড্রজাতির রাজধানী ছিল।

সেন, কখনও লক্ষ্মণাবতী বলিয়া অভিহিত নূতন গৌড়ে, এবং কখনও বা নবদ্বীপে থাকিয়া রাজ্যশাসন করিতেন। এরূপ প্রমাণ আছে যে, তিনি কোন কোন সময়ে বিক্রমপুরের রাজধানীতেও অবস্থিত রহিতেন। কিন্তু, লাক্ষ্মণেয়সেন নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া ঐ স্থানেই সমধিক অনুরক্ত হইলেন, এবং জন্ম হইতে জীবনের শেষ পর্য্যন্ত, ঐ এক স্থানেই অবস্থান করিলেন।*

নবদ্বীপ যেমন ভাগীরথীর তটবর্ত্তি নগর, পুরাতন গৌড়নগরও সেইরূপ ভাগীরথীর তটেই চিরকাল বিরাজমান।

* রাজা লাক্ষ্মণেয় যে কোন দিনও রামপালের রাজধানীতে বাস করিয়াছিলেন, এমন জানা যায় না। আদিশূর ও বল্লালের বিক্রমপুরস্থ রাজপ্রাসাদ লাক্ষ্মণেয়সেনের সময়ে একপ্রকার রাজশূন্য "পরিত্যক্ত পল্লী"। কিন্তু লাক্ষ্মণেয়সেনের পুত্র-পৌত্র-প্রভৃতি পরবর্ত্তীরা বিপদে পড়িয়া পুনরায় বিক্রমপুরে শতবর্ষের অধিক কাল বাস করিয়াছিলেন। সে কথা পরে বলিব। সেন বংশের বংশাবলী ও ইতিহাস বিষয়ে সুপ্রসিদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক, প্রীতিভাজন পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু অনেক নূতন বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু আমি দুর্ভাগ্যবশতঃ সময় ও স্বাস্থ্যের অভাবে এই সংস্করণে তাঁহার কোন কথারই আলোচনা করিবার সুযোগ না পাইয়া এবারকার জন্য আমার পুরাতন সংস্কারের উপরই নির্ভর করিয়া রহিলাম। অপিচ, সেন রাজাদিগের কথা এ পুস্তকের মুখ্য কথা নহে। লক্ষ্মণ অথবা লাক্ষ্মণেয় যিনিই হউন, নবদ্বীপের শেষ রাজা, সেন বংশীয়।

কিন্তু তথাপি, এই দুইয়ের মধ্যে হিন্দুর চক্ষে একটুকু বিশেষ প্রভেদ ছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গৌড়নগরের পূর্ব্বতন পাল-বংশীয় * রাজারা সকলেই বৌদ্ধ ছিলেন। ধর্ম্মপাল, দেব-

* পাল শব্দ পালরাজাদিগের জাতি-নাম নহে। যেমন মহানন্দ ও সুনন্দ প্রভৃতি নন্দবংশীয় রাজাদিগের নামের শেষে নন্দ শব্দ, এবং বুধগুপ্ত, ভানুগুপ্ত ও কৃষ্ণগুপ্ত প্রভৃতি গুপ্তবংশীয়দিগের নামের শেষে গুপ্ত শব্দ, পাল শব্দও সেইরূপ পালবংশীয়দিগের প্রকৃত নামের এক অংশ মাত্র। পাল বংশের প্রথম রাজার নাম গোপাল, দ্বিতীয় রাজার নাম ধর্ম্মপাল। যদি পাল শব্দ নামের অংশ না হইয়া জাতি-নাম হয়, তাহা হইলে প্রকৃত নাম হয় শুধু গো অথবা ধর্ম্ম। সেন রাজাদিগের নাম-নিবিষ্ট সেন শব্দও ঐ রূপ নামের অংশ; কায়স্থ, বৈদ্য অথবা অন্য কোনরূপ জাতির পরিচায়ক নহে। কালিদাসের মালবিকাগ্নিমিত্রনামক নাটকে মিত্র ও সেন এই দুইটি বংশের পরিচয় পাওয়া যায়। নাটকের নায়ক রাজা অগ্নিমিত্র। পুরাণে, ইতিহাসে এবং পুরাতন বৌদ্ধগ্রন্থেও তাঁহার পরিচয় আছে। অগ্নিমিত্রের পিতার নাম পুষ্পমিত্র; পুত্রের নাম বসুমিত্র; অথচ তিনি যাঁহাদিগের সহিত বিবাহজনিত সম্পর্কের সূত্রে বিশিষ্টরূপে সম্বদ্ধ, তাঁহারা সকলেই সেন। রাজমহিষী ধারিণীর এক ভ্রাতা ছিলেন, তাঁহার নাম বীরসেন। রাজার শেষপরিণীতা প্রণয়ানুগৃহীতা মালবিকার এক ভ্রাতার নাম মাধবসেন, আর এক ভ্রাতার নাম যজ্ঞসেন। যাঁহারা গৌড়াধিপতি পাল ও সেনদিগকে কায়স্থ অথবা বৈদ্য বলিয়া প্রমাণ করিবার জন্য নানাবিধ আধুনিক ও অপ্রামাণিক নগণ্য গ্রন্থের নাম লইয়া বৃথা শ্রম করেন, তাঁহারা পূর্ব্বোল্লিখিত মিত্র ও সেনদিগকে কোন্ জাতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিবেন?

পাল ও মহীপাল প্রভৃতি মহামতি গৌড়ীয় নৃপতিরা হিন্দু-দিগের প্রতি সর্ব্বপ্রকারে সদয় ব্যবহার প্রদর্শন করিয়া থাকিলেও, হিন্দুরা ধর্ম্মবিষয়ে তাঁহাদিগকে হৃদয়ের সহিত শ্রদ্ধা করিত না, এবং ধর্ম্মানুষ্ঠান-সময়ে তাঁহাদিগের সন্নিহিত হইতে ভালবাসিত না। গৌড়নগর, এই হেতু, সেই পাল-বংশীয়দিগের সময় হইতেই তীর্থগণনার বহিভূর্ত রহিয়াছিল। পক্ষান্তরে, নবদ্বীপ সেই গৌড়বাহিনী ভাগীরথীরই নাম-মহিমায় পূর্ব্বেও বহু হিন্দুর নিকট পবিত্র তীর্থ বলিয়া পূজা পাইয়াছিল, এবং লক্ষ্মণসেনের সময় হইতে রাজা লাক্ষ্মণেয়-সেনের বৃদ্ধি ও সমৃদ্ধির সময় পর্য্যন্ত উহা এক দিকে যেমন প্রধান তীর্থ, আর এক দিকে তেমনই আবার বিদ্যা-শিক্ষা ও বিদ্যালোচনার প্রধানতম ক্ষেত্র বলিয়া বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র বিখ্যাত হইয়া উঠিল। কেন না, দেশের বড় বড় পণ্ডিতেরা, রাজার আশ্রয়ে সুখ-সম্মানে জীবন যাপনের আশায়, নবদ্বীপে আসিয়া উপনিবিষ্ট হইলেন; এবং যাঁহারা বিষয়বৈভবে বড়, তাঁহাদিগের মধ্যেও অনেকেই নবদ্বীপে স্থান লইলেন। এই সকল কারণে নবদ্বীপই এ সময়ে, বঙ্গের সর্ব্বপ্রধান রাজধানী। উহা এ সময়ে প্রাসাদ-মালায় অলঙ্কৃত, পুণ্যতীর্থ বলিয়া গৌরবান্বিত, এবং পাণ্ডিত্য ও অন্যান্য প্রকারের গুণ-গৌরবেও দেশে বিদেশে সমাদৃত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ভারতে যবনাধিকার।

লাক্ষ্মণেয়সেন যে সময়ে নবদ্বীপ নগরে জন্মগ্রহণ করেন— (১১২৪ খৃঃ),—তাহার পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে, আরব দেশে মুসলমান ধর্ম্মের প্রথম প্রচার ও মুসলমানদিগের রাজ্যবিস্তার আরব্ধ হয়।

মহম্মদ ৫৭০ খৃঃ অব্দে, আরব দেশের মরুভূমিতে, মক্কা নগরে, জন্ম গ্রহণ করিয়া ৬৩২ খৃঃ অব্দে পরলোকে গমন করেন। তৎপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম ও ধর্ম্মরাজ্য, তদীয় মৃত্যুর পর, এক শত বৎসরের মধ্যেই, পশ্চিমে আফ্রিকা ও ইউরোপের অভিমুখে, আগুনের জিহ্বার মত, ক্রমে ক্রমে বিস্তারিত হইতে লাগিল, এবং পূর্বে আফগানস্থানের পূর্ব্বপ্রান্ত, অর্থাৎ সিন্ধুনদের তট পর্য্যন্ত আসিয়া ছাঁইয়া পড়িল। মুসলমানেরা সিন্ধুকে হিন্দু বলিতেন, সুতরাং সিন্ধুনদের পূর্ব্বতটবর্ত্তি সমস্ত স্থান, অর্থাৎ সমগ্র ভারতবর্ষ, এই সময় হইতেই, হিন্দুস্থান বলিয়া বিশেষ পরিচিত হইল, এবং ভারতবর্ষীয় আর্য্যেরাও হিন্দু বলিয়া অভিহিত হইলেন।

পারস্য দেশ, পূর্ব্বকালে, হিন্দু রাজ্যের অন্তর্গত না হইলেও, হিন্দুর আজ্ঞাধীন ছিল। হিন্দু রাজারা কখনও কখনও পারস্য দেশের রমণীদিগকে অন্তঃপুরে পুরমহিলাদিগের মধ্যে স্থান দান করিতেন। উল্লিখিত এক শত

বৎসরের মধ্যেই সমগ্র পারস্য মুসলমান হইল। পারস্যে যাহারা মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক ছিল, তাহারা প্রাণের ভয়ে সিন্ধু পার হইয়া, হিন্দুস্থানের অন্তর্গত গুজ্জর (গুজরাট) প্রদেশে আশ্রয় লইল। তাহারা এখনও সেখানে আছে; তাহাদিগকে পার্শি বলে। তাহারা সূর্য্য ও অগ্নির উপাসনা করে, এবং অনেকেই পুরাতন প্রথা অনুসারে গলায় উপবীতের অনুকরণে এক প্রকার উত্তরীয় ধারণ করে। আফগানস্থান পূর্ব্বাপরই হিন্দুরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। আফগান-স্থানের অন্তর্গত কান্দাহারের রাজকন্যা কুরু-কুল-ধন্যা গান্ধারী ভারতেশ্বর ধৃতরাষ্ট্রের রাজমহিষী এবং দুর্য্যোধনের জননী। কিন্তু, সেই পারসীক ও আফগান এবং সঙ্গে সঙ্গে মধ্য এসিয়ার অসংখ্য তাতার ও তুর্কমানেরা, মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া, মুসলমানী শক্তির সে নূতন তেজে, ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল;—অপিচ, হিন্দুর ধর্ম্ম নাশ ও হিন্দু-স্থানের সুখ-সাম্রাজ্য গ্রাস করিবার জন্য, সিন্ধুনদের পরপারে থাকিয়া দিবারাত্রি গর্জ্জিতে লাগিল।

ইহার কিছু দিন পরেই—(৭১৫ খৃঃ)—মুসলমানদিগের তদানীন্তন সম্রাট্ বোগ্‌দাদ-রাজধানীস্থিত খলিফা ওয়ালিদের আদেশক্রমে বস্‌রার সহকারী সেনাপতি মহম্মদ বিন্ কাশিম সিন্ধুনদের পূর্ব্বপারে, (অর্থাৎ সিন্ধ্ প্রদেশে), উপস্থিত হইয়া, সিন্ধুরাজ্যের পুরাতন রাজবংশকে বিনাশ করিলেন,—

বহুসংখ্য ব্রাহ্মণকে "ছুন্নত" করাইলেন—বহুসহস্রের যজ্ঞোপবীত ছিঁড়িয়া ফেলিলেন,—হিন্দু রমণীদিগের জাতিপাত ও সর্ব্বপ্রকার বিড়ম্বনার জন্য হুকুম দিলেন, * এবং আলোড় ও ব্রাহ্মণাবাদ অধিকার করিয়া দেবালয় সকল লুণ্ঠন করিতে লাগিলেন।

দেবালয় লুণ্ঠন, দেববিগ্রহ চূর্ণন এবং হিন্দুর জাতিনাশের এই যে প্রথা পড়িল, ইহা আর থামিল না। বিন্ কাশিমের নাম লোপ পাইতে না পাইতে, সুলতান মামুদের নাম লোকের মুখে মুখে উচ্চারিত হইতে লাগিল। আফগানস্থানের অন্তর্গত গজনি নগরে তুর্কজাতীয় মুসলমানদিগের

---

* "Casim at first contented himself with circumcising all the Bramins; but, incensed at their rejection of this sort of conversion, he ordered all above the age of seventeen to be put to death, and all under it, with the women, to be reduced to slavery. * * * The Mahometan historians concur in relating that among the numerous female captives in Sind were two daughters of Raja Dahir, who, from their rank and their personal charms, were thought worthy of being presented to the Commander of the Faithful. They were accordingly sent to the Court and introduced into the harem." (*Elphinstone's History of India.*)

একটি প্রবলপরাক্রান্ত নূতন রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইল, এবং তুর্কদিগের তৎকালের অধিনায়ক সবক্তগিনের পুত্র সুলতান মামুদ, সেই গজনি রাজ্যের সর্ব্বেশ্বর হইয়া, ভারতসাম্রাজ্যের উপর বজ্রের বেগে পুনঃ পুনঃ আপতিত হইলেন, * এবং তিনি তাঁহার তুর্ক-সেনা লইয়া যে পথ দিয়া যখন গমন করিলেন, সেই পথের দূর্ব্বা পর্য্যন্তও যেন দগ্ধ করিয়া গেলেন।

কাশ্মীর ও কান্যকুব্জ এবং দিল্লী ও দ্বারকা প্রভৃতি সমস্ত প্রধান নগরই দুর্দ্দান্ত মামুদের ভয়ে দিবারাত্রি থর থর কম্পিত রহিল। মামুদের সময়ে আরও বহুসহস্র হিন্দুর জাতি গেল, মান গেল এবং মনুষ্যত্ব লোপ পাইল। হিন্দুস্থানের কুল-রমণীরাও তখন, জাতি—মান এবং জাতীয় ধর্ম্মরক্ষার নিমিত্ত, অঙ্গের আভরণ বিক্রয় করিয়া, দেশীয় রাজাদিগের সহায়তা করিতে লাগিলেন। কিন্তু, হিন্দু রাজারা তখন দশজনে এক জনের অধীন হইয়া কার্য্য করিতে অসমর্থ। সকলেই প্রতি-বেশী রাজার প্রভু কিংবা প্রণয়িরূপে কার্য্য করিবার জন্য উৎসুক; কোন ব্যক্তিই ক্ষমতা কিংবা যোগ্যতার বিচার অনুসারে প্রতিবেশীর সম্পূর্ণ প্রভুত্ব স্বীকার করিয়া কর্ম্ম-ক্ষেত্রে তাঁহার আজ্ঞাধীন রূপে দণ্ডায়মান হইতে প্রস্তুত

* সুলতান মামুদ ক্রমে দ্বাদশ বার ভারতবর্ষের উপর আক্রমণ করেন। তাঁহার প্রত্যেক বারের আক্রমণেই ভারতবর্ষের অসংখ্য গ্রাম ও নগর ধ্বস্ত হইয়াছে,—অসংখ্য নর-নারীর শোকাবহ সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে।

নহেন। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহই এই হেতু মামুদের শক্তি-রোধ করিতে সমর্থ হইলেন না। মামুদের বড় সাধের গজনি হইতে গুজরাটের সোমনাথ মন্দির পাঁচ শত ক্রোশের পথ। সুলতান মামুদ, সেই সোমনাথের মন্দির ভাঙ্গিয়া, মন্দিরের সুরম্য প্রস্তরাদি দ্বারা গজনির রাজপ্রাসাদের সিঁড়ি বানাইলেন, এবং সোমনাথের চিরপূজিত পবিত্র বিগ্রহকে ভাঙ্গিয়া চূরিয়া তাহার বিবিধ উপকরণের দ্বারা আপনার মন্দির সাজাইলেন। হিন্দুদিগের মধ্যে ইহা দেখিয়া শুনিয়া অনেকেই মনে মনে এই স্থির বুঝিল যে, হিন্দুধর্ম্মের ভক্তি ও সাধন-ভজনের কথা ভূতের প্রলাপ মাত্র, উহার মধ্যে সারবস্তু কিছুই নাই; সুতরাং সমস্ত হিন্দুকেই এক দিন মুসলমান হইতে হইবে।

মামুদ ১০৩০ খৃঃ অব্দে ৬৩ বৎসর বয়সের সময়ে চক্ষু বুজিলেন এবং হিন্দুরা কিছু দিনের জন্য সামান্য একটুকু শান্তি লাভ করিল। তাঁহার সেই সুবিশাল সাম্রাজ্য, যেন মনুষ্যকে সাংসারিক সম্পদের অসারতা প্রদর্শনের জন্য, অচিরেই কাঁচের ভাণ্ডের ন্যায়, চূর চূর করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল। আফগানস্থানের মধ্যে কাবুলের নিকটে, ঘোর নামে একটি গিরিবেষ্টিত প্রদেশ আছে। সেই ঘোর-নিবাসী আফগানেরা মামুদের রাজধানী ও রাজ-সিংহাসন কাড়িয়া নিল। তদীয় উত্তরাধিকারীরা সিন্ধুনদের পূর্ব্বপারে, পঞ্জাব

প্রদেশে, আশ্রয় লইয়া রহিল। পঞ্জাব, হিন্দুর অধিকার হইতে স্খলিত হইয়া, মুসলমানের উদরস্থ হইল।

ঘোরীয় আফগানদিগের রাজপুরুষেরা কিছু কাল স্বরাজ্য-কলহ লইয়া ব্যাপৃত রহিলেন; ভারতলুণ্ঠনের জন্য অবকাশ পাইলেন না। কিন্তু, সাহাবুদ্দীন ওরফে মহম্মদ ঘোরী যখন—(১১৫৭ খৃঃ)—ঘোর-রাজ্যের সর্ব্বপ্রধান সেনাপতি হইয়া তাহার কএক বৎসর পরে, সুলতানের পদে অভিষিক্ত হইলেন, ভারতীয় আর্য্যের আনন্দনিবাসে তখন আবার সহসা দাবানলের ন্যায় বেড়া আগুন জ্বলিয়া উঠিল।

মহম্মদ ঘোরীর সময়ে দিল্লীর সিংহাসনে প্রসিদ্ধনামা পৃথ্বীরাও, * কান্যকুব্জের সিংহাসনে পৃথ্বীরাজের শ্বশুর সুপরিচিত রাজা জয়চন্দ্র; বঙ্গের সিংহাসনে লাক্ষ্মণেয়।

* রাজা পৃথ্বীরাও ভারতরাজ্যের শেষ সময়ের ইতিহাসে উজ্জ্বলতম নক্ষত্র। দিল্লীর পূর্ব্বপ্রান্তে যে স্থানে এইক্ষণ কুতবমিনার, উহার মেঘস্পর্দ্ধী মস্তক তুলিয়া, দণ্ডায়মান রহিয়াছে, তাহারই অতিনিকটে পৃথ্বীরায়ের পুরাতন প্রাসাদ ও কীর্ত্তিস্তম্ভ নিচয়ের ভগ্নাবশেষ তরু, লতা ও গুল্মপ্রভৃতির আচ্ছাদনে লুক্কায়িত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। লোকে বলে যে, ঐ কুতবমিনারের পুরাতন নাম যমুনাস্তম্ভ এবং পৃথ্বীরায়ই উহা তাঁহার একটি বিধবা কন্যার চিত্ততর্পণের উদ্দেশ্যে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। রাজকন্যা, সময়ে সময়ে, ঐ স্তম্ভের শীর্ষদেশে শিবিকাযোগে সমানীত হইয়া অবস্থান করিতেন, এবং সেখান হইতে যমুনার পুণ্য পুঞ্জময় শ্যাম-সলিল দর্শনে চিত্তে পরিতৃপ্ত হইয়া পিতৃনিবাসে ফিরিয়

তাঁহাদিগের সকলেরই সিংহাসন টলিল, রাজ্য টল টল হইল, রাজ্যের বক্ষঃস্থলে রক্তের নদী বহিল। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই শতসহস্র কণ্ঠে হাহাকার ধ্বনি হইতে লাগিল।

বঙ্গাধিপতি লাক্ষ্মণেয় যখন সোত্তর বৎসর বয়সের শক্তিসামর্থ্য-হীন অকর্ম্মণ্য বৃদ্ধ, সেই সময়েই হিন্দুর গৌরব-সূর্য্য, গগনের পশ্চিম রেখায় না পঁহুছিয়াই, অকস্মাৎ অস্ত গেল। দিল্লীর অনতিদূরে থানেশ্বর নামক একটি সুপ্রসিদ্ধ স্থান আছে। ১১৯৩ খৃঃ অব্দে থানেশ্বরের সন্নিহিত তিরোরির সুবিস্তৃত প্রান্তরে হিন্দু মুসলমানে একটা ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইল। মুসলমান সম্রাট্ মহম্মদ ঘোরী, ইহার পূর্ব্বে, বহুযুদ্ধে হিন্দু রাজাদিগের নিকট পরাভব পাইয়া, প্রণত ভাব দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু, সে দিন থানেশ্বরের যুদ্ধে তাঁহার কপাল ফিরিল। তাঁহার আশা ও রক্ত-পিপাসা পরিপূর্ণ তৃপ্তিলাভ করিল। তিনি সেই দিনই ভারতবর্ষের সম্রাট্ বলিয়া পূজা পাইলেন। ভীষ্ম,দ্রোণ ও কর্ণার্জ্জুনের বাহুপরিরক্ষিত পুণ্যক্ষেত্ররূপা ভারতভূমি,ভোগ-বিহ্বল কুসন্তানগণের কর্ম্মদোষে তাঁহার পায়ে লুটাইয়া পড়িল।

আসিতেন। কিন্তু সেই যমুনাস্তম্ভ এইক্ষণ কুতবমিনার। উহার গায়ে পূর্ব্বে যাহা লেখা ছিল, কুতব তাহা পুঁছিয়া ফেলিয়াছেন, এবং সে মহাস্তম্ভের সমস্ত অঙ্গে তাঁহার স্বীয় জীবনের ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত লিপি-বদ্ধ করিয়া উহাকে মুসলমানের বস্তু করিয়া লইয়াছেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বঙ্গে—নবদ্বীপের পথে—যবন।

মহম্মদ ঘোরীর এক বিশ্বস্ত ও কর্ম্মনিপুণ ক্রীতদাস ছিলেন। তাঁহার নাম কুতবুদ্দীন। কুতবের জন্মভূমি এসিয়ার অন্তর্গত তুর্কস্থান। তিনি যখন অল্পবয়সের বালক, তখন এক মুসলমান বণিক্ তাঁহাকে অর্থদ্বারা ক্রয় করিয়া আফগানস্থানে লইয়া যায়, এবং সেখানে তিনি ক্রয়-বিক্রয়ের প্রক্রিয়ায় ক্রমে দুই তিন হাত পার হইয়া পরিশেষে মহম্মদ ঘোরীর হস্তগত হন। সেই হইতেই তাঁহার সৌভাগ্যের অভ্যুদয়। তিনি মহম্মদের আশ্রয়ে যুদ্ধবিদ্যা ও রাজকার্য্যের উপযোগী সর্ব্বপ্রকার শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া দিন দিন উন্নতির পর উন্নতি লাভ করিলেন, এবং ভারতীয় রাজাদিগের সহিত মহাযুদ্ধের সময়ে নানা প্রকারে আপনার সাহস, পরাক্রম ও কার্য্য-দক্ষতা প্রদর্শন করিয়া মহম্মদের বিশেষ প্রীতিভাজন হইলেন। মহম্মদ ঘোরী গজনি ফিরিয়া গেলেন; তাঁহার সেই ক্রীতদাস কুতব, স্বকীয় প্রভুর প্রতিনিধিরূপে দিল্লীর সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া, হিন্দুর ধর্ম্মসংস্কারের উপর দয়া-ধর্ম্ম-শূন্য আক্রমণ ও সর্ব্বপ্রকার সুখ-সম্পদ উদরস্থ করিবার জন্য, ভারতবর্ষের সকল দিকেই হস্ত প্রসারণ করিলেন। দিল্লীতে যে কুতবমিনার রহিয়াছে তাহা এইক্ষণ কুতবুদ্দীনেরই কীর্ত্তিস্তম্ভ।

কুতবুদ্দীনও, রাজ-পদ-লাভের পর, এক বিশ্বস্ত ও কূট-নীতি-বিশারদ কর্ম্মচারী পাইয়াছিলেন। তাঁহার নাম ভক্তিয়ার খিলিজী। খিলিজী সাহেব, আকৃতিতে নিতান্ত খর্ব্ব ও রূপে মর্কটতুল্য হইলেও, মুসলমানদিগের ভারতীয় ইতিহাসে তাঁহার বড় নাম। কুতবের নিকট প্রথমে তাঁহার কোন রূপেই প্রতিপত্তি ছিল না। কিন্তু তিনি বিহার-প্রবেশের সময় বহু লোকের সহিত বিশ্বাসঘাতকতায় কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন বলিয়াই, প্রতিনিধি সম্রাট্ শেষে তাঁহাকে একটুকু বেশী প্রীতি ও বিশ্বাস করিতে লাগিলেন। কুতবের সিংহাসন প্রাপ্তির দশ বৎসরের মধ্যেই ভক্তিয়ার, মিথিলা ও মগধ রাজ্য বিলুণ্ঠন ও বিধ্বস্ত করিয়া, হিন্দুমাত্রকেই ভয়ে কম্পিত করিয়া তুলিলেন, এবং ১২০৪ খৃঃ অব্দে বঙ্গেশ্বর লাক্ষ্মণেয়কে বঞ্চনার যুদ্ধে রাজ্যচ্যুত করিয়া, আপনি বঙ্গের রাজা হইলেন।

এ সময়ে লাক্ষ্মণেয়সেন অশীতিপর বৃদ্ধ, একবারে অশক্ত, অচল, এবং আপনার জন্য আপনি ক্ষণকালও কর্ত্তব্যচিন্তা করিতে অসমর্থ। যখন তিনি, মধ্যাহ্নে স্নান-আহ্নিক করিয়া, অন্তঃপুরের সুরক্ষিত কক্ষে আহারে উপবিষ্ট, তখন তাঁহার কাছে সংবাদ পঁহুছিল যে, তিনি যাঁহার ভয়ে রাত্রিতেও সুখে নিদ্রা যাইতে পারেন না, সেই ভয়ঙ্করকর্ম্মা ভক্তিয়ার তাঁহার দুয়ারে।

ভক্‌তিয়ার কর্ত্তৃক বিহার লুণ্ঠনের পর, বঙ্গদেশের নর-নারীরা, রাত্রির সুখ-শান্তিময় সুনিদ্রার মধ্যেও তাঁহার সে বিকট-কঠোর ভীষণ-মূর্ত্তি স্বপ্নে দেখিয়া, চমকিত হইয়া উঠিত। বঙ্গের যে সকল বড় বড় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত রাজার আশ্রয়ে থাকিয়া পলান্নভোজনে পুষ্ট রহিয়াছিলেন, তাঁহারাও শাস্ত্র খুলিয়া—শাস্ত্রের বচন তুলিয়া—রাজাকে সর্ব্বদা এইরূপ উপদেশ করিতেন যে, তুর্কের হাতে হিন্দুর রাজ্য-লোপ শাস্ত্রে লেখা আছে, এবং ভক্‌তিয়ারই সেই শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট তুর্ক। মানুষ যখন আপনি ভীত হয়, তখন অন্যের মনেও সে ভয়ের ভাব উৎপাদন করিতে ভালবাসে। পণ্ডিতেরাও সম্ভবতঃ এই ভাবেই শাস্ত্রার্থের বিড়ম্বনা করিয়া রাজার চিত্তে পূর্ব্ব হইতে ভয় জন্মাইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য যাহাই হউক, অনুষ্ঠিত নীতির পরিণাম ফল যার পর নাই শোচনীয় হইল, এবং তাঁহাদিগের নাম বাঙ্গালার ইতিহাসে চিরকালের তরে কলঙ্কের রেখায় অঙ্কিত হইয়া রহিল। কেন না, রাজা লাক্ষ্মণেয় ভক্‌তিয়ারের নামমাত্র শ্রবণ করিয়াই একবারে জড়ীভূত ও জীবন্মৃতের ন্যায় আড়ষ্ট হইয়া পড়িলেন।

বঙ্গের রাজকীয় সৈন্যসংখ্যা তখন অর্দ্ধলক্ষেরও অধিক। রাজা যখন শুনিতে পাইলেন যে, তাঁহার সেই অর্দ্ধলক্ষ সৈন্যের মধ্যে এক জনও ভক্‌তিয়ারের গতিরোধের জন্য

অস্ত্র ধারণ করে নাই, তখন তিনি স্পষ্টই বুঝিলেন যে, এত দিনে তাঁহার কপাল ভাঙ্গিয়াছে,—শাস্ত্রের লেখা এত দিনে সফল হইয়াছে,—পণ্ডিতেরা তাঁহাকে প্রতিদিন যাহা বুঝাইয়াছেন কালের পূর্ণতায় সেই কথা এত দিনে কর্ম্মফলে পরিণত হইতে যাইতেছে। তাঁহার মন তখন প্রাণের ভয়ে এবং নানা রূপ বিপদ ও দুঃখ দুর্গতির চিন্তায় অস্থির হইয়া উঠিল, এবং তিনি চক্ষে আর পথ না দেখিয়া—কাহাকে কি কহিবেন, কাহার সাহায্যে সেই দুরন্ত যবনের গতিপথে বাধা দিবেন, ইহার কিছুই অবধারণ করিতে না পারিয়া,—সেই অর্দ্ধভুক্ত অবস্থায়ই খিড়কীর পথে নৌকায় উঠিয়া, জগন্নাথক্ষেত্রে দেহপাতের কামনায়, কটকের অভিমুখে পলায়ন করিলেন। তদীয় অন্তঃপুরবাসিনী অসূর্য্যম্পশ্যা কুলকামিনীরাও, গৃধ্রভীত গৃহকপোতীর ন্যায়, তাঁহার সঙ্গেই চলিয়া গেলেন; এবং বঙ্গের হিন্দু রাজলক্ষ্মী, বিজয়া দশমীর বিষাদ-মলিনা প্রতিমার মত, অসংখ্য নর-নারীর নয়ন জলে স্নাত হইয়া, নবদ্বীপের প্রান্তবাহিনী গঙ্গার জলে নিমজ্জিত হইলেন!

ভকৃতিয়ার, নবদ্বীপের অদূরে, বন-ভূমির অন্ধকারে, তাঁহার সৈন্যসামন্ত লুকাইয়া রাখিয়া, সতরটি সুনিপুণ সৈনিকমাত্র সঙ্গে লইয়া, অতিথির বেশে রাজপুরীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তিনি যেই জানিতে পারিলেন যে, রাজা পলা-

হইয়াছেন, রাজপুরী শূন্য হইয়াছে, এবং রাজার অমাত্যবর্গ, ভয়ে ও লজ্জায়, নিজ নিজ অন্তঃপুরে লুকাইয়া রহিয়াছে, অমনি তিনি ভারত-লুণ্ঠনের ভূত-কথাস্মরণে ও সুলতান মামুদ এবং মহম্মদ ঘোরী প্রভৃতির অনুকরণে নবদ্বীপলুণ্ঠনের 'আম' হুকুম প্রচার করিলেন; আর, যাহাকে সম্মুখে পাইলেন, তাহারই শিরশ্ছেদ করিতে লাগিলেন। যেখানে সকলে এত দিন, মাতৃক্রোড়ে শিশুর ন্যায়, সুখ-শান্তির ক্রোড়ে নির্ভয়ে বিশ্রাম করিতেছিল, সেখানে সহসা রক্তের ধারা বহিল,—চারিদিকে একটা হুলুস্থূলু হল হল্লা পড়িয়া গেল। অনেকে, সে রক্ত-গঙ্গার তরঙ্গ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য, গঙ্গার জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া প্রাণ-ত্যাগ করিল,—অনেকে দেশান্তরের আশ্রয় লইল। ভক্তিয়ারও এইরূপে এই বিশাল বঙ্গ-রাজ্য বিনা যুদ্ধে করায়ত্ত করিয়া, বিজয়ের শিঙ্গা বাজাইলেন, এবং রাজপ্রাসাদের রুধিরাক্ত ধূলিরাশি হইতে বঙ্গের রাজমুকুট কুড়াইয়া তুলিয়া, বিনা বিরোধে তাহা মাথায় পরিলেন।

দেখিতে দেখিতে আড়াই শত বৎসর চলিয়া গেল; এবং দিল্লীর যবন ক্রমে বঙ্গের নগরে নগরে ও গ্রামে গ্রামে আপনার অধিকার বিস্তার করিল। ভক্তিয়ার খিলিজী রণে নবদ্বীপে যবনের একখানি মাত্র পতাকা উড়াইয়াছিলেন, ক আড়াই শত বৎসরে বঙ্গভূমির প্রায় সমস্ত স্থানই যবনের রাজপতাকায়

আচ্ছাদিত হইল। লাক্ষ্মণেয়সেনের বংশধরেরা, বিক্রমপুর ও সুবর্ণগ্রামে শক্তির সামান্য একটুকু ছায়া পাইয়া, পূর্ব্ববঙ্গ-প্রদেশে কিছু কাল রাজত্বের শ্বেতচ্ছত্র ও শোভামাত্র ভোগ করিতেছিলেন। কালে সেই বিক্রমপুর, সুবর্ণগ্রাম এবং ইদেল-পুর ও চন্দ্রদ্বীপ প্রভৃতি সুরক্ষিত ও সুপরিচিত স্থান সকলও যবনের নিকট মাথা নোয়াইল। দেশের প্রায় সমস্ত বিভাগ ও ভূভাগ, ভিন্ন ভিন্ন যবন জায়গিরদারের নামে, নূতন নাম পাইল। * স্থানে স্থানে, মন্দিরের ইষ্টকে মনোরম মস্‌জিদ সকল গঠিত হইয়া মনুষ্যের চক্ষু আকর্ষণ করিল। নবদ্বীপ ও শান্তিপুর প্রভৃতি বড় বড় গ্রামে কাজীর মোকাম বসিল,—সিপাহী-সংরক্ষিত শ্মশ্রুমণ্ডিত কাজীরা, হিন্দুশাস্ত্রের কোন বিষয়েই কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা লাভ না করিয়া হিন্দুসমাজের বিচারপতি হইল। অনেক হিন্দু, পদ-প্রতিপত্তি কিংবা সম্প-ত্তির লোভে অথবা প্রাণের ভয়ে—অনেকে প্রতিবেশী যবনের অত্যাচারে—জাতীয় ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কলমা পড়িল; অনেকে যবন না হইয়াও যবনের আশ্রয় লইল,—'লিবাজে ও রেওয়াজে' যবনের মত হইয়া রহিল। বঙ্গীয় হিন্দুর বড় আদ-রের বাঙ্গালা ভাষা, সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার প্রাণ বল-লাভে,

* মকিমপুর, মামুদপুর, কাশীমপুর, রছুলপুর, রহিমগঞ্জ, রহমতগঞ্জ, দৌলতাবাদ, মকিমাবাদ, তালিপাবাদ, নওয়াদ্দা ও নবীগঞ্জ প্রভৃতি শত লক্ষ স্থানের নাম এ কথার নিদর্শন।

এক মহোজ্জ্বল মধুর মূর্ত্তিতে ফুটিতেছিল। বাঙ্গলা এখন বাধ্য হইয়াই, বহুল পরিমাণে বিবির বুলি শিখিল। বাঙ্গালি আবখোড়ায় জল খাইল, বাড়ীর নিকটস্থ মখ্‌তবে মুন্সী কিংবা মৌলবীর কাছে আপনার আহওয়াল জানাইয়া, নানাবিধ এলেম ও আদবকায়েদা অভ্যাস করিল,—গার্হস্থ্যজীবনের উৎসবে ও আপদে গাজি ও পাঁচ পীরের নামে সিন্নী দিতে শিখিল,—গৃহিণীর কাছে রামায়ণ ও মহাভারত অথবা সীতা ও সাবিত্রীর সুপবিত্র ইতিহাসের সঙ্গে লয়লা ও মজনুর ললিত মধুর লীলার 'কেচ্ছা' অথবা গুলেবকওয়ালীর গঞ্জনার গীত শুনাইয়া প্রকৃত হিন্দুত্ব হারাইল,—গায়ে আল্‌খেলা পরিয়া কপোলে জুল্‌ফি দোলাইল, এবং পাঁচ ইয়ারের মজ্‌লিসে যাবনিক প্রথায় 'ওঠক বৈঠক' করিতে লাগিল। বঙ্গ-দেশের সামাজিক আচার ব্যবহারের স্তরে স্তরে—আমোদে —অঙ্গাভরণে, নাচে—গানে, যবনের আচার-ব্যবহার ও রুচি-প্রবৃত্তি অনেক প্রকারে মিশিয়া গেল।

বঙ্গদেশের সহিত সর্ব্বপ্রথমে আফগানস্থানী পাঠানদিগেরই পরিচয় হইয়াছিল। কেন না, পাঠানেরাই ভারতজয় ও বঙ্গবিজয়ের দ্বারা এ দেশে প্রথম প্রতিষ্ঠিত। পাঠানের পর, হাব্‌সী ও খোঁজা প্রভৃতি নানাজাতীয় যবন, ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের ন্যায়, বঙ্গদেশে প্রবেশ করিল; এবং কিবা বলে, কিবা ছলে, কিবা অন্যরূপ কর্ম্মকৌশলে, যে যেরূপে পারিল, সেই রূপেই

সে, সোনার বঙ্গে সুদৃঢ় হইয়া বসিল ও বাঙ্গালির বুকের রক্ত শোষণ করিয়া, আপনার পরিপোষণের পথ দেখিল। * হিন্দু এখন এ দেশের উপনিবিষ্ট যবনকে আপনার জন বলিয়া জানে,—আপনার জ্ঞানে ভালবাসে, এবং সময়ে সময়ে ক্রূর-বুদ্ধি হিন্দু-প্রতিবেশীর উৎপীড়ন হইতে আত্মরক্ষার জন্য হয়ত কোন করুণার্দ্র-চিত্ত যবনের আশ্রয়ে জীবন যাপন করে। অপিচ, যবনেরাও হিন্দুর প্রতি সর্ব্বপ্রকারেই সৌহার্দ্দ ও সহৃদয়তার আদর প্রদর্শন করিয়া থাকে; এবং যবনের মধ্যে যাহারা বুদ্ধিমান্ ও বিষয়ী, তাহারা প্রকৃতপ্রস্তাবে হিন্দুর দ্বারাই সর্ব্বপ্রকারে পরিবেষ্টিত রহে। অধিক আর কি, অধুনাতন যবন অথবা মুসলমানের মধ্যে এখানে সেখানে এমনও অনেক আছেন, যাঁহাদিগকে সহৃদয় ও উদারমতি হিন্দুরা দেবতুল্য সাধু-জ্ঞানে শ্রদ্ধা করিয়া থাকে। কিন্তু তখনকার হিন্দু যবনকে বিষ-সর্প হইতেও অধিকতর ভয় করিত, এবং যবনও হিন্দুর মর্ম্মপীড়নকেই জীবনের প্রধানতম কার্য্য বলিয়া জানিত।

বঙ্গরাজ্যে হিন্দুর শেষ সময়ের রাজধানী ছিল নবদ্বীপে।

* এই সময়েই বঙ্গদেশে পীরপাই, পাইকান, খানেখোদাই ও খানদেশীয়ান প্রভৃতি নানারূপ নিষ্কর মহালের নূতন সৃষ্টি হইতে লাগিল। হিন্দু ভূপতিদিগের অনেক দেবোত্তর ও ব্রহ্মোত্তর ভূমি মুসলমানদিগের অধিকারে নিষ্কররূপে পরিভুক্ত হইল।

যবনের এক রাজধানী হইল দিনাজপুরের নিকট দেবকোট নামক স্থানে এবং আর এক রাজধানী হইল গৌড় নগরে। নবদ্বীপ আঁধারে ডুবিল। যবনের মুখ্য রাজধানী গৌড় নগরই বঙ্গের মুকুটমণি বলিয়া শোভা পাইতে লাগিল,—বঙ্গের সর্ব্বপ্রকার সুখ-সম্পদের সামগ্রী কাড়িয়া আনিয়া রাজভোগের উপযোগি প্রাসাদ, পুষ্পোদ্যান এবং বহুসংখ্য বাজার ও বিপণি সাজাইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পণ্ডিতের নবদ্বীপ।

পুরাতন বঙ্গের গৌড় * এবং বল্লালের লক্ষ্মণাবতী, যবন রাজাদিগের দুর্জ্জয় ও দুঃসহ মহিমায়, কিছু দিনের মধ্যেই, নবদ্বীপের সকল সম্পদ শত মুখে শুষিয়া নিল; কিন্তু নবদ্বীপের একটি সম্পদ বাকি রহিল। তাহাতে যবনের হাত পড়িল না। যবন রাজপুরুষেরা তাহা কোন প্রকারেই লুঠিয়া নিতে পারিল না। সে সম্পদ নবদ্বীপের সারস্বত-ভাণ্ডার—সরস্বতীর পূজার সামগ্রী;—সে সম্পদ বাল্মীকি ও ব্যাস-প্রভৃতি ঋষিতাপসগণের প্রাণারাধ্য সংস্কৃত ভাষা, এবং

---

*"The most ancient name for the city itself would seem to be Lakshmanawati, a Sanskrit form which is usually corrupted into Laknauti. On the other hand, the name of Gaur is of primeval antiquity, as is shown by the existence and traditional dignity of the Gauriya Brahmans; * * * its ascertained history begins with its conquest in 1204 A. D. by the Muhammadans, who retained it as the chief seat of their power in Bengal for more than three centuries. This was the period during which were erected the numerous mosques and other Musalman buildings, which yet remain in tolerable state of preservation." (*W. W. Hunter's Statistical Account of Bengal.*)

সংস্কৃত শাস্ত্রের শত-শাখা-বিস্তারিত জ্ঞানোজ্জ্বল পাণ্ডিত্য-গৌরব।

নবদ্বীপ পূর্ব্বে ছিল রাজার রাজধানী, এখন হইল পর-মুখ-প্রেক্ষী দরিদ্র ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের অথবা জ্ঞানের রাজধানী। শত্রু উহার শিরোভূষণ রাজমুকুট, বলে কিংবা ছলে, অপহরণ করিল বটে; কিন্তু উহার জ্ঞানের মুকুট, যেন সে দুঃখ-দুর্দ্দিনের অন্ধকারে আত্ম-প্রকাশের অধিকতর অবকাশ পাইয়া, নিশীথিনীর গভীর অন্ধকারে, নক্ষত্রমালাময় প্রাকৃত মুকুটের ন্যায়, অধিকতর উজ্জ্বল হইল,—যেন উহা কি এক অপূর্ব্ব জ্যোতিতে ঝল ঝল করিতে লাগিল। বঙ্গদেশের যে সকল বড় বড় পণ্ডিত, হিন্দু রাজাদিগের সময়ে, নবদ্বীপে বাড়ি ঘর বানাইয়া বসতি করিতে ছিলেন, তাঁহাদিগের বংশধরেরাও কালে বিখ্যাত পণ্ডিত হইয়া উঠিলেন। যে সকল উদ্যমশীল ও তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালী বিদার্থী যুবা, স্বদেশে বিবিধ বিদ্যা শিক্ষা করিয়া, পাঠ-সমাপনের উদ্দেশ্যে নব-দ্বীপে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যেও অনেকে পাঠ-সমাপনের পর নবদ্বীপেই অবস্থিত রহিলেন। ইহাতে নব-দ্বীপের অতি বড় বেশী শ্রীবৃদ্ধি হইল। নবদ্বীপের ঘরে ঘরে টোল বসিল। ঘাটে, মাঠে ও নগরের পথে শাস্ত্রালাপের শ্রুতিসুখকর সুমধুর ধ্বনি অহরহ লোকের শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। হিন্দু রাজার সময়ে নগর ছিল গঙ্গার এক পারে,

এখন দুই পারই নগরের মত শোভা পাইল। নগরের একটা অংশ বিদ্যানগর বলিয়া পরিচিত হইল। ফলতঃ, পণ্ডিতের নবদ্বীপ, সংস্কৃতশাস্ত্রের বিশেষ আলোচনার জন্য, সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে, একটি বিশেষ প্রসিদ্ধ স্থান বলিয়া পরিচিত হইয়া উঠিল।

নবদ্বীপের এই এক বিষয়ে যেমন বড় একটা নাম হইল, দুর্ভাগ্যবশতঃ যবনাধিকারের কিছু কাল পরেই আর এক বিষয়ে সেইরূপ একটা নিন্দা রটিল। যাঁহারা ভক্তির পথে পথিক—ভগবানের প্রেমপূর্ণ মধুর নামে প্রাণের আকর্ষণে অনুরক্ত, তাঁহারা নবদ্বীপকে 'কুতর্কের কেল্লা' বলিয়া মনে মনে ভয় ও বিদ্বেষ করিতে লাগিলেন। টোলের ছাত্রেরা, এক সময়ে বঙ্গদেশের অনেক স্থলেই, অশিষ্ট, উদ্ধত, গুরু-লঘু-জ্ঞান-শূন্য এবং "বিশ্বনিন্দুক" বলিয়া নিন্দিত ছিল। নবদ্বীপের ছাত্রেরা, এ অংশে সর্ব্বত্রই একটু বিশেষ চিহ্নিত হইল। যাঁহারা ছাত্রদিগের অধ্যাপক, তাঁহাদিগের মধ্যেও অনেকের প্রতিই সারগ্রাহী সাধুসজ্জনদিগের মনে অশ্রদ্ধা জন্মিল।

তবে কি নবদ্বীপে ধর্ম্মের কোন অনুষ্ঠান ছিল না? ছিল বটে, কিন্তু সে ধর্ম্ম অথবা সে অনুষ্ঠান প্রাণ-শূন্য দেহের মত। নবদ্বীপের পণ্ডিতেরা অবশ্যই গলায় তুলসী কিংবা রুদ্রাক্ষের মালা পরিতেন, ললাটে তিলক কিংবা শিবমৃত্তিকার ফোঁটা

দিতেন, এবং বিষয়িদিগকে স্মৃতি-শাস্ত্রের বিবিধ সূক্ষ্মব্যবস্থা পালনের জন্য সর্ব্বদাই নানারূপ শাসনবাক্যে শিক্ষাদান করিতেন। হিন্দুসমাজের বার মাসের বাঁধা প্রণালীর ক্রিয়া কর্ম্ম এবং দোল দুর্গোৎসব প্রভৃতি উৎসব সকলও, বঙ্গীয় সমৃদ্ধ ব্যক্তিদিগের ক্রিয়া-কর্ম্মের ন্যায়, অবশ্যই নবদ্বীপে গৃহে গৃহে পরিলক্ষিত হইত। কোন কোন পণ্ডিত, কালিদাসের ঋতুসংহার অথবা বিক্রমোর্ব্বশী প্রভৃতি কাব্যনাটকাদি পাঠের সঙ্গে, ভাগবত কিংবা ভগবদ্গীতা প্রভৃতি ভক্তিগ্রন্থও ছাত্রদিগকে অবসরক্রমে পাঠ করিয়া শুনাইতেন। কেহ কেহ বা বেদান্তের বিবিধ সূত্রব্যাখ্যায় আপনার অসামান্য বিচার-নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়া শ্রোতৃবর্গের বিস্ময় জন্মাইতেন। কিন্তু মনুষ্য যে শ্রেণির মনুষ্যকে অভিমানশূন্য অথচ প্রেমের আনন্দে পরিপূর্ণ 'দীন হীন' ভক্ত বলে,—যাঁহারা, এই অনন্ত জগতের অধীশ্বরকে একটি সুদূরস্থিত অন্ধশক্তি অথবা সুষুপ্ত কারণ মাত্র মনে না করিয়া, পিতা মাতা ও প্রাণদেবতা জ্ঞানে, প্রাণের মধ্যে পূজা করেন—প্রাণভরা ভালবাসায় আরাধনা করিতে চাহেন, এবং আপনার প্রাণের জন অথবা প্রাণের প্রাণ জ্ঞানে, কিবা সুখে কিবা দুঃখে, সকল সময়েই তাঁহার দিকে চাহিয়া রহেন, নবদ্বীপবাসিদিগের মধ্যে তাদৃশ প্রকৃত ভক্তের সংখ্যা পূর্ব্বাপরই বড় কম ছিল। যাঁহারা ভক্ত বলিয়া একটুকু পরিচিত হইতেন, অনেকেই

তাঁহাদিগকে ঘৃণার চক্ষে নিরীক্ষণ করিত। ঐরূপ সরল-হৃদয় ভক্তিমান্ ব্যক্তিরা, নবদ্বীপের ভক্তিশূন্য ধর্ম্ম এবং হৃদয়শূন্য ক্রিয়াকর্ম্ম দেখিয়া, অন্তরে সর্ব্বদাই অতিগভীর দুঃখ অনুভব করিতেন। তাঁহারা নবদ্বীপ হেন স্থানে কোথায়ও যাইয়া প্রাণ জুড়াইবার সামগ্রী পাইতেন না, ইহা তাঁহাদিগের প্রাণে সহিত না।

ভগবানের ইচ্ছায় অকস্মাৎ নবদ্বীপে ভক্তির 'মনভুলান' মধুমাখা গীত মানুষের কানে পশিল। মনুষ্য, নিদারুণ অনাবৃষ্টির সময়ে, মরুভূমিতে অকস্মাৎ মেঘের মধুর-গভীর মোহন-ধ্বনি শুনিলে, হৃদয়ে যেমন আকুল হয়, নবদ্বীপবাসি-দিগের মধ্যেও অনেকেই সেই ভক্তির গীত শুনিয়া আকুল হইল। অনেকেরই হৃদয় কেমন একটা অপূর্ব্ব আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। শাস্ত্রীয় মল্লযুদ্ধের মহাক্ষেত্র নবদ্বীপ। সেই নবদ্বীপে, কেমন করিয়া, কার কি আকর্ষণে—কার কি মন্ত্রগুণে, অকস্মাৎ একটি ভক্তির সভা প্রতিষ্ঠিত হইল! কারুরচিত কৃত্রিম কুসুম, দেখিতে অতি সুন্দর হইলেও, রস-মাধুর্য্যহীন, সৌরভশূন্য এবং স্পর্শে কর্কশ। তাদৃশ কুসুমে কেমন করিয়া হাসি ফুটিল, সৌরভ ছুটিল, এবং কোথা হইতেই বা তাহাতে রসের মাধুরী ও স্পর্শ-শীতলতা সহসা আসিয়া স্থান লইল! যেখানে লোকে ভক্তির নামটিমাত্র উচ্চারণ করিতেও ভয়ে ও লজ্জায় জড়সড় হইত, সেখানে কি কারণে, ভক্তের মৃদঙ্গ

বাজিয়া উঠিল,—লোকে হরি হরি হরি বলিয়া, নয়নজলে ভাসিয়া, ভক্তিগদ্গদচিত্তে মাটিতে লুটাইতে লাগিল।

নবদ্বীপের এই আকস্মিক পরিবর্ত্ত বস্তুতঃই নিতান্ত বিস্ময়াবহ। যে জগতে কুশের একটি ক্ষুদ্র অঙ্কুরও বিনা কারণে দেখা দেয় না, এবং আপনার নিয়তিনির্দ্দিষ্ট কার্য্য না করিয়া বিলয় পায় না,—কুশাগ্রবিলম্বি জলকণাও বিনা কারণে ঝরিয়া পড়ে না, এবং ঝরিয়া পড়ার পরেও আপনার বিধিনির্দ্ধারিত বিশেষ কার্য্য সম্পাদন না করিয়া শুকাইয়া যায় না, সেই জগতে শুধু মনুষ্যের হৃদয়োচ্ছ্বাস ও শত শত হৃদয়ের সম্মিলিত আন্দোলনই কি কার্য্য-কারণের সম্পর্ক-শূন্য? যাঁহারা এ জগতের ছোট বড় সমস্ত ঘটনাকেই বিজ্ঞানের চক্ষে অধ্যয়ন করিয়া বিধাতৃশক্তির সজীবতায় বিশ্বাস করিতে শিখিয়াছেন, তাঁহারা কি শুধু মানবজীবনের বিবিধ ইতিবৃত্ত ও নানা সময়ের নানাবিধ বিচিত্র পরিবর্ত্তকেই বিধাতার অধিকারবহির্ভূত বলিয়া নির্দ্দেশ করিবেন? যাহা হউক, এইক্ষণ এই ভক্তিসভার প্রকৃত তত্ত্ববিষয়ে কএকটি পুরাতন কথা লইয়া পাঠকের সহিত ক্ষণকাল অন্য প্রসঙ্গের আলোচনা করিব। এ নূতন জোয়ারের নূতন তরঙ্গের সহিত পুরাতন গঙ্গার কোন প্রকার গূঢ় সম্পর্ক আছে কি না, তাহাও এস্থলে বুঝিবার জন্য যত্নবান্ হইব।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

নবদ্বীপে—ভক্তিসভা।

ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণই ভারতে ভক্তিধর্ম্মের যুগান্তর প্রবর্ত্তক, এবং তাঁহার মুখের কথা ও মঙ্গলময় মনোহর ইতিহাস লইয়াই গীতা ও ভাগবত প্রভৃতি ভক্তিশাস্ত্রের প্রকাশ।

ভক্তি মনুষ্যমাত্রেরই প্রাণ-প্রিয় বস্তু। কেন না, দয়া ও প্রীতি প্রভৃতি মনোবৃত্তিগুলি, যার পর নাই মধুর-মূর্ত্তি ও উদার-প্রকৃতি হইলেও, পৃথিবীতেই পরিতৃপ্ত রহে; কখনও পৃথিবীর বন্ধন অতিক্রম করিয়া উপরে উঠিতে পারে না। কিন্তু ঊর্দ্ধাভিলাষিণী ও উচ্চাশয়া ভক্তি, পিতা মাতা ও জ্ঞানদাতা গুরু প্রভৃতির পূজা দ্বারা, সোপানের পর সোপানে ও উচ্চতার পর উচ্চতায় উঠিয়া, ক্রমে এই পৃথিবীকে অতিক্রম করে; এবং যিনি এই অনন্তজগতের অনন্তদেব, তাঁহাকে খুঁজিয়া লইয়া, তাঁহার পাদপদ্মে বিলীন রহে। ভক্তি এই অংশে দয়া ও প্রীতির অনেক উপরে।

অপিচ, পৃথিবীর সুখ-সম্পদের সহিত দয়া ও প্রীতির যেরূপ সম্পর্ক, ভক্তিরও সেইরূপ অথবা ততোধিক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। কারণ, যেখানে গুণে, জ্ঞানে অথবা গুরুজনে মনুষ্যের ভক্তি নাই, সেখানে পারিবারিক সুখ সম্যক্ ফুটিতে পারে না; ফুটিলেও দীর্ঘস্থায়ি হয় না;—সৌহার্দ্দ, কুসুম-দল-বিলম্বি শিশির-বিন্দুর ন্যায়, ক্ষণকাল নিতান্ত সুরম্য

মূর্ত্তিতে বিলসিত হইলেও, ক্ষণকালের বেশী তিষ্ঠিয়া রহে না ;—সাংসারিক ভোগ-বিলাসে আকাঙ্ক্ষার অনুরূপ তৃপ্তি জন্মে না, এবং হৃদয় ও মনের উচ্চতর শক্তিনিচয় উপযুক্ত বিকাশের পথ পায় না। মনুষ্য, এই সকল কারণে, সকল দেশে এবং সকল সময়েই ভক্তির সম্মান করিয়াছে, এবং যাঁহারা মনুষ্যজাতির গুরু অথবা পথ-প্রদর্শক বলিয়া জগতে পূজা পাইয়াছেন, তাঁহারা ভক্তিকেই মনুষ্যের সর্ব্বপ্রধান সম্পদ ও সর্ব্বপ্রকার সুখ-শান্তির প্রস্রবণ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

ভারতীয় সভ্যতা, ভক্তিকেই উহার বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়া জগতে প্রস্ফুটিত হইয়াছে ; এবং উহার প্রথম উন্মেষের সময় হইতে উন্নতির চরম বিকাশ পর্য্যন্ত চিরদিনই উহা ভক্তির অমৃতদানে জীবের হৃদয়ে আনন্দ জন্মাইয়াছে। সে ভক্তি, হিমাদ্রির উচ্চতম-শিখর-স্থিত শিলারুদ্ধ ভাগীরথীর ন্যায়, কিছু কাল ঋষিযোগীর জ্ঞান-শিলায় নিরুদ্ধ ছিল। দেশের সর্ব্বসাধারণ লোকেরা উহার কাছে পঁহুছিতে পারিত না। কিন্তু, যখন 'জীব-হৃদয়-রঞ্জন'—'জীবের বিপদ্-ভয়-ভঞ্জন'—জগন্মঙ্গলব্রত, পুরুষোত্তম কৃষ্ণ, ভারতের আর্য্যাবর্ত্ত প্রদেশে, ভুবন-মোহন বেশে, অবতীর্ণ হইয়া, ধর্ম্মপরায়ণ যুধিষ্ঠিরকে আশ্রয়দানে ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন করিলেন, তখন সে ভক্তির গঙ্গা, জ্ঞান-শিলার সমস্ত বন্ধন অতিক্রম

করিয়া, শত ধারায়, বহিতে লাগিল, এবং ভারতবর্ষের প্রায় সকল স্থানেই ভক্তির এক অভাবনীয় আন্দোলন উপস্থিত হইল। যোগী ও ঋষিরা যাঁহাকে সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম, মহৎ হইতেও মহৎ, অথচ প্রাণিগণের হৃদয়-নিহিত পরমাত্মা * বলিয়া চিন্তা করিতেন, এবং তাঁহারা যাঁহাকে অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ ও অব্যয় বলিয়া বুঝাইতে চাহিতেন, দেশের দীন-দুঃখী কাঙ্গালেরাও তাঁহাকে তখন কাঙ্গালের ধন, দীন-দয়াময় বলিয়া ডাকিতে শিখিল, এবং জ্ঞানীরাও জ্ঞান ও যোগ-ধর্ম্মের নিরাকার ব্রহ্মকে কৃপাসিন্ধু ও প্রাণবন্ধু বলিয়া পূজা করিতে আরম্ভ করিল। ভক্তের প্রাণ পরিপূর্ণ তৃপ্তিলাভে শীতল হইল, এবং সেই মহাভাবময় ভক্তিধর্ম্মের সহিত শ্রীকৃষ্ণের মধুর কথা ও মধুমাখা নাম চিরকালের তরে ইতিহাসে গাঁথা হইয়া রহিল। তখন ভারতবর্ষে কৃষ্ণদ্বেষী লোক ছিল না, এমন কথা নহে। কৃষ্ণানুরক্ত সহৃদয় ভক্তেরা যেমন কৃষ্ণনাম লইয়া একে অন্যের কাছে আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতেন; কৃষ্ণদ্বেষী কঠোর-ভাষী ব্যক্তিরাও সেই রূপ, দেশে দেশে,

---

* "অণোরণীয়ান্মহতো মহীয়ান্
আত্মাস্য জন্তোর্নিহিতো গুহায়ান্—"

অথবা,—

"অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্
তথাঽরসন্নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।"

তাঁহার অযশের উদ্দেশ্যে, নানারূপ কুৎসিত কাহিনী রটনা * করিয়া বেড়াইত। কিন্তু, ধর্ম্মই কালে অধর্ম্মকে পরাভব করিল, এবং ভক্তির অমৃতপ্রবাহ অভক্তির বিষ-বিদ্বেষকে শুষিয়া ফেলিল। ভক্তি ভারত-হৃদয়ের অন্তরতম নিকেতনে, জয়ের আসনে, দেব-বিগ্রহের ন্যায়, প্রতিষ্ঠিত হইয়া পুষ্পচন্দনে পূজা পাইল।

যেমন ভাগীরথীর নির্ম্মল জলরাশিতেও, স্থানে স্থানে, আবিলতা ঘটে, ভক্তির নির্ম্মল স্রোতেও মনুষ্যজগতে মাঝে মাঝে, সেইরূপ আবিলতার সংস্পর্শ সংঘটিত হইয়া থাকে।

* শিশুপাল ভীষ্মকে ভর্ৎসনা করিয়া কহিতেছেন—

"যাহাকে বালকেরাও ঘৃণা প্রদর্শন করে, তুমি জ্ঞান-বৃদ্ধ হইয়া সেই গোপালের প্রশংসা করিতেছ। কৃষ্ণ বাল্যকালে শকুনি এবং যুদ্ধানভিজ্ঞ অশ্ব ও বৃষভ নষ্ট করিয়াছিল, তাহার আশ্চর্য্য কি? চেতনাশূন্য কাষ্ঠময় শকট পাদদ্বারা পাতিত করিয়াছিল, তাহাই বা এত কি অদ্ভুত কর্ম্ম? না বাল্মীকপিণ্ড মাত্র যে গোবর্দ্ধন সপ্তাহ ধারণ করিয়াছিল, তাহাই বিস্ময়কর? এই ঔদরিক বাসুদেব পর্ব্বতোপরি ক্রীড়া করিতে করিতে যে রাশীকৃত অন্ন ভোজন করিয়াছিল, তাহা শ্রবণ করিয়াই সেই মুগ্ধস্বভাব গোপবালকেরা বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিল। এই দুরাত্মা বলবান্ কংসের অন্নে প্রতিপালিত হইয়া তাহাকেই সংহার করিয়াছে, এই পৌরুষের কার্য্যেই বিস্মিত হইয়াছ?" (কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদিত মহাভারত।)

ইহা জলের দোষ নহে; স্থান অথবা পাত্রের দোষ। আকাশের জল সুরভি কুসুমের বক্ষঃস্থলে পতিত হইলে, তখন উহার এক রস ও এক স্বাদ; এবং মাটীতে পড়িলে, আর এক রস ও আর এক স্বাদ। কৃষ্ণপ্রতিষ্ঠিত ভক্তির ধর্ম্ম, ভারতের অনেক স্থলেই, কিছু কাল পরে, দেশ, কাল ও পাত্রভেদে নানাবিধ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, নানাবিধ ভাব ও রসে পরিণত হইল; এবং যাহারা এক সময়ে কৃষ্ণপ্রেমে প্রাণ, মন ও সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া তদ্গত হইয়াছিল, তাহাদিগের মধ্যেও অনেকে কৃষ্ণোক্ত নির্ব্বিকার ধর্ম্মে নানাবিধ বিকৃতির লক্ষণ দেখিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের আশ্রয় লইল।

বৌদ্ধধর্ম্মের মূলমন্ত্র দয়া, মুখ্যকর্ম্ম আত্মসংযম ও জীবের মঙ্গলসাধন, এবং চরমলক্ষ্য নির্ব্বাণ, অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি অথবা আত্মার লয়। উহার প্রতিষ্ঠাতার পূর্ব্বনাম শাক্যসিংহ এবং প্রচলিত নাম বুদ্ধদেব। বুদ্ধদেব খৃঃ পূঃ ৫৫৭ অব্দে—(অর্থাৎ সম্ভবতঃ শ্রীকৃষ্ণের নয় শত বৎসর পরে)—ভারতবর্ষের অন্তর্গত কোশলরাজ্যের অনতিদূরে, কপিলবস্তু নগরে, জন্ম গ্রহণ করিয়া খৃঃ পূঃ ৪৭৭ অব্দে পরলোক প্রাপ্ত হন, এবং তদীয় প্রশান্ত-গভীর প্রথম-বয়সের সময় হইতে জীবনের শেষ পর্য্যন্ত—(৫২৭—৪৭৭ খৃঃ পূঃ)—অর্থাৎ অর্দ্ধশতাব্দী কাল, বহু সহস্র শিষ্য সঙ্গে লইয়া ভারতের বহু স্থলেই তাঁহার এই অভিনব ধর্ম্ম প্রচার করেন।

যদিও বৌদ্ধধর্ম্মের কাছে বেদ-বেদান্ত প্রভৃতি সকল শাস্ত্রই সমান মিথ্যা,—স্বর্গ ও স্বর্গস্থ দেব দেবীর কথা স্বপ্নবৃত্তান্তের ন্যায় অলীক, এবং আশা ও আকাঙ্ক্ষার চরম স্থান প্রকৃত প্রস্তাবে অন্ধকার, তথাপি উহা "অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ" এই মহাবাক্যের মোহন-আকর্ষণে শত সহস্র লোকের আত্মাকে টানিয়া লইল, এবং ভারতবর্ষের পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম ও উত্তর হইতে দক্ষিণ পর্য্যন্ত আপনার আধিপত্য স্থাপন করিয়া,পরিশেষে সিংহল, শ্যাম, ব্রহ্ম, যাপান ও চীন প্রভৃতি সুদূরবর্ত্তি স্থানসমূহেও অতি অল্পকালের মধ্যেই প্রচারিত হইল। আমাদিগের এ বঙ্গদেশও কিছু কালের তরে বৌদ্ধধর্ম্মের সে নীরসনির্ম্মল ভক্তিশূন্য নৈরাশ্যের মধ্যেই ডুবিয়া রহিয়াছিল। কেন না,যখন পাল রাজারা গৌড়ের অধীশ্বর, তখন বৌদ্ধধর্ম্মই রাজধর্ম্ম বলিয়া বঙ্গদেশের নানা স্থানে বিশেষরূপে প্রবল।

কিন্তু, বৌদ্ধধর্ম্ম; চীন ও সিংহল প্রভৃতি দেশে অক্ষয়বটের ন্যায় চিরস্থায়ী হইয়া রহিলেও, ভক্তির জন্মভূমিস্বরূপা ভারতভূমিতে উহা দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারিল না। বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যন্তরে শম, দম, সাম্য, শুদ্ধাচার, অক্রোধ, অলোভ, আত্মশাসন, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ও জীবের উপকার প্রভৃতি ধর্ম্মের সকল তত্ত্বই, উজ্জ্বলতম হীরক-চূর্ণের ন্যায়, ঝল ঝল করিতেছিল; ছিল না কেবল ভগবানের সুধাসিক্ত নাম ও ভক্তির স্বর্গীয় সুধা। যে ভারত এক সময়ে, বৌদ্ধধর্ম্মের সে হীরকোজ্জ্বল

জ্যোতি দেখিয়া আকৃষ্ট হইয়াছিল, সেই ভারতই, কতিপয় শতাব্দীর পর, যেন প্রাণের শত-গুণ-বর্দ্ধিত পিপাসায়, কৃষ্ণ-প্রেমময় ভক্তিধর্ম্মের জন্য, পুনরায় আর এক ভাবে উন্মাদিত হইল, এবং ভারতবাসী বৌদ্ধধর্ম্মের সকল বন্ধন ছিঁড়িয়া ফেলিয়া, আবার 'হা কৃষ্ণ'—'হা করুণাসিন্ধু'—'হা দীন-বন্ধু' বলিয়া কাঁদিতে লাগিল। যেন ভারতের প্রাণটা এই অমূল্য সত্য বুঝিয়া লইল যে, হীরক যত কেন উজ্জ্বল হউক না, উহাতে পিপাসার নিবৃত্তি হয় না। পিপাসার নিবৃত্তি হয় অমৃতে, এবং সেই অমৃতেরই আর এক নাম ভগবানে ভক্তি। এই আকুলতার উন্মাদ-সময়ে অনেকে অমৃত ভ্রমে আবিল জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল। কিন্তু তাহা-তেও যেন তাহাদিগের প্রাণ জুড়াইল।

বৌদ্ধবিজয়ী ধর্ম্মপ্রচারকদিগের মধ্যে সিদ্ধ যোগী ও স্বভাব-সুন্দর সাধু, মহাত্মা শঙ্করাচার্য্যের নামই বহু কারণে সকলের অগ্রগণ্য। যে সময়ে (৬০০—৬৫০ খৃঃ অঃ) মহম্মদ ও তাঁহার শিষ্যবর্গ, আরবদেশে মুসলমান ধর্ম্মের উদ্ভাবন ও প্রচার লইয়া, তুমুল ব্যাপারে বিলিপ্ত, বিখ্যাতনামা শঙ্করাচার্য্যও প্রায় সেই সময়েই ভারতে তাঁহার অদ্বৈতবাদ-প্রচার এবং বৌদ্ধধর্ম্মের অসারতাবিষয়ক বিচার লইয়া অহোরাত্র ব্যাপৃত। কিন্তু যাঁহারা বৌদ্ধধর্ম্মের বিলয়ের অব্যবহিত-পূর্ব্ব-সময়ে ভারতে শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি পুরাণ-

প্রদর্শিত ভক্তিধর্ম্মেরই সর্ব্বাঙ্গীণ পুনরুজ্জীবন করেন, তাঁহাদিগের মধ্যে রামানুজ ও মধ্বাচার্য্য এই দুইয়ের নামই বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা উভয়েই পরম বৈষ্ণব ও পরম ভক্ত, এবং 'বৃন্দাবন বিহারী' 'ভূভার-হারী' ভগবান্ বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণই, ইঁহাদিগের উভয়ের মতে পূর্ণব্রহ্ম পরাৎপর। *

---

* শঙ্করাচার্য্যও শ্রীকৃষ্ণকে বিষ্ণুর অবতার ও পূর্ণব্রহ্ম বলিয়া হৃদয়ে বিশ্বাস করিতেন। এ কথার এক প্রমাণ তৎপ্রণীত গীতাভাষ্য,আর এক প্রমাণ তৎপ্রণীত স্তবাবলী। পাঠকের পরিতৃপ্তির জন্য এ স্থলে শঙ্করাচার্য্যকৃত একটি সুমধুর স্তোত্র উদ্ধৃত হইল। কিন্তু পাঠকের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, শঙ্করাচার্য্যের হৃদয়ে প্রেমভক্তিপূজ্য বিষ্ণু অথবা হরি এবং যোগারাধ্য ও যোগেশ্বর হর এক এবং অভিন্ন পদার্থ। এই অংশেই তাঁহার সহিত তৎপরবর্ত্তী রামানুজ ও মধ্বাচার্য্য প্রভৃতি সম্প্রদায়প্রবর্ত্তক বৈষ্ণব গুরুদিগের বিশেষ মত-ভেদ। কথিত স্তোত্রটি এই,—

"অবিনয়মপনয় বিষ্ণো! দময় মনঃ শময় বিষয়-মৃগতৃষ্ণান্। ভূতদয়াং বিস্তারয় তারয় সংসার-সাগরতঃ। ১।——দিব্যধুনীমকরন্দে পরিমল-পরিভোগ-সচ্চিদানন্দে। শ্রীপতি-পদারবিন্দে ভবভয়খেদচ্ছিদে বন্দে। ২।——সত্যপি ভেদাপগমে নাথ! তবাহং ন মামকীনস্ত্বম্। সামুদ্রো হি তরঙ্গঃ ক্বচন সমুদ্রো ন তারঙ্গঃ। ৩।——উদ্ধৃতনগনগভিদনুজ! দনুজকুলামিত্র! মিত্রশশিদৃষ্টে। দৃষ্টে ভবতি প্রভবতি ন ভবতি কিং ভব-তিরস্করঃ। ৪।——মৎস্যাদিভিরবতারৈরবতারবতাঽবতা সদা বসুধাম্। পরমেশ্বর! পরিপাল্যো ভবতা ভবতাপভীতোঽহম্। ৫।——দামোদরগুণমন্দিরসুন্দরবদনারবিন্দ গোবিন্দ। ভবজলধিমথ-

রামানুজ, শঙ্করাচার্য্যের তিন শত বৎসর পরে এবং
ম্ভবতঃ শ্রীগৌরাঙ্গের সাড়ে তিন শত বৎসর পূর্ব্বে, দক্ষিণ-
ারতে প্রাদুর্ভূত হন, এবং ভারতবর্ষের বহু স্থানে বহুসংখ্য
ক্তসম্প্রদায় সংস্থাপন করিয়া পরলোকে গমন করেন।
মানুজও শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় বেদান্তদর্শনের এক অভিনব
ষ্য রচনা দ্বারা পৃথিবীর সর্ব্বত্রই বিশেষ পরিচিত হন।
ন্তু তাঁহার মতে জীব আর ব্রহ্ম এক হইয়াও এক নহে।

মধ্বাচার্য্যও দাক্ষিণাত্যের লোক। তিনি রামানুজের
মবার্দ্ধক্যের সময়ে, এবং শ্রীগৌরাঙ্গের প্রায় তিন শত
সর পূর্ব্বে, জন্ম গ্রহণ করেন; এবং তিনিও, বহুসংখ্য
পাসু ভক্তকে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা ও কৃষ্ণ-নাম-প্রচারের সঙ্গে
ত্র ভক্তি-ধর্ম্ম বিস্তারের নানারূপ উপদেশ দিয়া পরিণত
স তিরোহিত হন। মধ্বাচার্য্যের শিষ্যসম্প্রদায়, সংখ্যায়
দাচার প্রভৃতি বিবিধ গুণের গৌরবে, কালে রামানুজের
্যসম্প্রদায় অপেক্ষাও অধিকতর সম্মান লাভ করিল, এবং
য় পঞ্চদশতম প্রধান শিষ্য মহাত্মা মাধবেন্দ্রপুরীর সময়ে
মধ্বসম্প্রদায়ই ভারতবর্ষের সমস্ত স্থানে ভক্তের অগ্রগণ্য
য়া বিখ্যাত হইল। মাধবেন্দ্রই আমাদিগের এ বঙ্গদেশে

র পরমং দরমপনয় ত্বং মে। ৬।——নারায়ণ! করুণাময়! শরণং
ণি তাবকৌ চরণৌ। ইতি ষট্‌পদী মদীয়ে বদনসরোজে সদা
। ৭।——

ভক্তিধর্ম্মের প্রাণদাতা, এবং নবদ্বীপের ভক্তিসভা তাঁহারই মানস-কুসুম। শ্রীগৌরাঙ্গ যখন অল্পবয়সের বালক, মাধবেন্দ্র সেই সময়ে প্রচারক্ষেত্রে দণ্ডায়মান, এবং শ্রীগৌরাঙ্গের বয়ঃ-প্রাপ্তির পূর্ব্বেই তাঁহার তিরোধান।

মাধবেন্দ্র যেমন পণ্ডিত, তেমনই বুদ্ধিমান্ এবং আপনার হৃদয়-নিহিত ভক্তির প্রভাবে পরকীয় চিত্তবৃত্তির উপর কার্য্য করিবার জন্যও, তেমনই অসাধারণ ক্ষমতাবান্ লোক ছিলেন। তাঁহার প্রাণ ও মন, সকল সময়েই, কৃষ্ণপ্রেমে উচ্ছ্বসিত রহিত, এবং তিনি যে পথ দিয়া চলিয়া যাইতেন, সেই পথেই ভক্তিধর্ম্মের নূতন অঙ্কুর উঠিত,—অথবা পুরাতন বৃক্ষ, নূতন পত্রপল্লবে পরিশোভিত হইয়া, নূতন শোভা ধারণ করিত।

মাধবেন্দ্র অনেক সময়ই মথুরায় থাকিতেন; মথুরায় থাকিয়া বৃন্দাবনের শ্যাম-শোভাময় নিবিড় বন-ভূমির মধ্যে, শ্যামসুন্দরের শৈশব ও যৌবন-লীলার সুখ-স্মৃতিময় পবিত্র স্থান সকল খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য, কখনও গোবর্দ্ধনের সানুদেশে, কখনও বা যমুনার শ্যামল-তটে, পুত্রহারা জননীর মত, ঘুরিয়া বেড়াইতেন, এবং যেন প্রত্যেক বৃক্ষ ও প্রত্যেক লতার নিকটই তাঁহার সে প্রাণাধিক ধনের সংবাদ জানিতে চাহিয়া, শোকাশ্রু বিসর্জ্জন করিতেন। মথুরা, বৌদ্ধদিগের প্রবলতার সময়ে, কৃষ্ণ-নাম বিস্মৃত হইয়া, সর্ব্বাঙ্গে বৌদ্ধমঠ ও বৌদ্ধমন্দির ধারণ করিয়াছিল; এবং

সুলতান মামুদের ভারত-প্রবেশের সময় হইতে, মথুরা মুসলমানকে উহার রত্নরাশি উপহার দিয়া, হৃতাভরণা দুঃখিনী অথবা দগ্ধপল্লবা ব্রততীর ন্যায়, বিষাদের প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপ দণ্ডায়মানা ছিল। কিন্তু তথাপি সে মথুরানাথের নাম-স্মরণে মথুরা মাধবেন্দ্রের বড় ভালবাসার স্থান ছিল। তিনি তাঁহার শেষ বয়সে, অধিক সময়ই ঐ স্থানে অতিবাহিত করিতেন, এবং কোন কোন সময়ে জগন্নাথের মূর্ত্তিদর্শনের অভিলাষে, ঐ স্থান হইতে জগন্নাথক্ষেত্রে যাইবার পথে, পণ্ডিতের নবদ্বীপে, দুই চারি দিন প্রচ্ছন্ন অতিথিস্বরূপ অবস্থিত রহিতেন।

একবার মাধবেন্দ্র, এই রূপ পথ-পর্য্যটনের সময়ে, নবদ্বীপ হইতে শান্তিপুর গিয়াছিলেন, এবং সেখানে কমলাক্ষ ভট্টাচার্য্য নামক জনৈক তেজস্বী ও তত্ত্বজিজ্ঞাসু যুবার হৃদয়ের আমন্ত্রণে আপ্যায়িত হইয়া দিন কএক সেইখানেই রহিয়াছিলেন। এই কমলাক্ষই বঙ্গের তদানীন্তন ভক্তমণ্ডলীর প্রথম প্রতিষ্ঠাতা এবং বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের অদ্বৈতপ্রভু। ইঁহার পূর্ব্বনিবাস শ্রীহট্ট এবং শেষ-নিবাস শান্তিপুর। পূর্ব্বে ইনি কমলাক্ষ নামেই নবদ্বীপ ও শান্তিপুরের পণ্ডিত-সমাজে এক জন গণ্য মান্য পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত ছিলেন; মাধবেন্দ্রের নিকট মন্ত্রগ্রহণের সময় হইতে বাঙ্গালার ইতিহাসে অদ্বৈত গোস্বামী নামে বিশেষ পরিচয় লাভ করিলেন।

নবদ্বীপের ভক্তিসভা, বৈষ্ণবগ্রন্থপত্রের অনেক স্থলেই,

অদ্বৈত-সভা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ইহা অসঙ্গত হয় নাই। কারণ, অদ্বৈত আচার্য্যই ঐ সভার প্রথম ভিত্তি এবং সে সময়ের প্রধান আশ্রয়। মাধবেন্দ্র অদ্বৈতকে কি উদ্দেশ্যে কি রূপ উপদেশ করিয়াছিলেন, তাহা জানিবার কোন সম্ভাবনা নাই। কিন্তু, ইহা বিলক্ষণরূপে জানা যাইতেছে যে, মাধবেন্দ্রের সহিত সেই সাক্ষাতের কিছু দিন পরেই, অদ্বৈত যখন নবদ্বীপে আসিয়া আর এক টোল খুলিলেন, এবং টোলের বহির্বাটীতে ভক্তিসভার প্রতিষ্ঠা করিয়া, সেখানে গীতা ও ভাগবত পাঠ এবং হরিনাম-কীর্ত্তনের আনন্দময় উৎসব আরম্ভ করিলেন, তখন নবদ্বীপে একটা বিষম আন্দোলন উপস্থিত হইল। শ্রীবাস ও শ্রীনিধি প্রভৃতি অনেক শান্ত শিষ্ট ব্রাহ্মণপণ্ডিত অদ্বৈতের সহিত যোগ দিল। যাহারা আপনাদিগকে প্রখর পণ্ডিত অথবা খরতর বুদ্ধিমান্ বলিয়া মনে করিত না, এমন বহু লোকই অদ্বৈতের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া আনন্দ করিতে লাগিল, এবং সে পণ্ডিতের নবদ্বীপে,—নবপ্রতিষ্ঠিত সভা-মণ্ডপে, এত কালের পর, প্রায় প্রতিদিনই ভক্তির নিগূঢ় তত্ত্ব লইয়া বিশেষ আলোচনা, এবং ভক্তের প্রাণারাধ্য হরিকথাপ্রসঙ্গে প্রেমের স্রোত বহিল। দার্শনিকতার সে কঠোর দুর্গের মধ্যেও অনেক দীন-দুঃখীর চক্ষে দয়াময়ের মধুমাখা নামে অশ্রু ঝরিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

ভক্তিসভায় নূতন স্রোত।

পাহাড়ের ঝরণার জল কেমন করিয়া ধীরে ধীরে স্রোতস্বিনীর মূর্ত্তি ধারণ করে? সে দৃশ্য যে একবার দেখিয়াছে, সে জীবনে কখনও আর তাহা ভুলিতে পারে না। উহা পাহাড়ের প্রান্তভূমিতে কলকলায়মান জলরাশিমাত্র,—কখনও উছলিয়া উছলিয়া আনন্দের উচ্ছ্বাস দেখাইতেছে, কখনও তরুণ তপনের কনককান্তিতে বিলসিত হইয়া রূপের অনির্ব্বচনীয় বৈচিত্র্য প্রদর্শন করিতেছে—কখনও প্রলয়ের আতঙ্ক জন্মাইয়া গর্জ্জিতেছে, কখনও পাগলের মত খল খল করিয়া হাসিতেছে,—মানে ফুলিতেছে, প্রেমে দুলিতেছে, এবং কখনও বা মেঘাবৃত যামিনীর মেঘভাঙ্গা বিষণ্ণ জ্যোৎস্না গায়ে মাখিয়া বিষাদের গীত গাইতেছে। একটুকু নীচে নামিলেই দেখা যায় যে, সে উচ্ছ্বসিত জলরাশি একটি জলরেখার মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে এবং পাগল যেমন সময়ে সময়ে কাহাকেও কিছু না বলিয়া, প্রাণের জ্বালায় কোন এক দিকে ছুটিয়া বাহির হয়, উহাও সেইরূপ পাহাড়ের পাদ-পীঠ হইতে বাহির হইয়া, যেন কাহার অন্বেষণে, এক দিকে বহিয়া যাইতেছে। আর একটুকু অগ্রসর হইলেই দৃষ্ট হয় যে, সেই ক্ষীণ-শরীরা জল-রেখা, চারি দিক্ হইতে, আপনার সমান কিংবা আপনা হইতে ক্ষুদ্র আরও কএকটি জল রেখার সহিত

সম্মিলিত হইয়া, নদীর মত ঢেউ তুলিয়া, নূতন আনন্দে প্রবাহিত হইতেছে! তাই বলিয়াছি, এ দৃশ্য একবার যদি হৃদয়-পটে অঙ্কিত হয়, তাহা হইলে আর কখনও তাহা বিস্মৃত হইতে পারা যায় না।

নবদ্বীপের ভক্তিসভাও আগে ঐ রূপ একটি ক্ষীণ-শরীরা জল-রেখা ছিল। ক্রমে উহার সহিত একটি দুইটি করিয়া ভক্তিপূর্ণ প্রাণের সম্মিলন হইতে লাগিল, এবং সে নিত্য নূতন ভক্তিসম্মিলনে, উহা ক্রমশঃ 'হৃষ্ট', ক্রমশঃ 'পুষ্ট' হইয়া, স্রোতস্বিনীর সুখ-সৌন্দর্য্য ও শক্তিলাভে, তর তর বেগে চলিল।

মানুষের প্রাণটা কি? উহা কি দ্রব, না ঘন পদার্থ? মানুষ যখন দুঃখে পোড়ে,—শোকে কিংবা শোক হইতেও অধিকতর দুঃসহ অন্য কোন মর্ম্মদাহি সন্তাপে জর্জ্জরিত রহে,—তখন মনে লয় যে, মানুষের প্রাণটা বুঝি সোনা, রূপা অথবা কাঠ পাটের মত কোন এক রূপ ঘন কঠিন ও দাহ্য পদার্থ। নহিলে, উহা অহোরাত্র ঐ রূপ জ্বলিবে কেন? আবার যখন মানুষ, স্নেহে গলিয়া অথবা প্রণয়ে ঢলিয়া, মানুষের প্রাণে আপনার প্রাণটাকে মিশাইয়া ফেলে, তখন মনে লয় যে, প্রাণটা বুঝি ননি-মাখন অথবা ফুলের মধুর মত দ্রব-মন, কিংবা জলের মত দ্রব পদার্থ। জল যেমন জলের গায়ে ঢলিয়া পড়ে,—জলের সহিত মিশিয়া এক হইয়া থাকিতে ভালবাসে, মানুষের প্রাণও যখন পরের প্রাণে সেইরূপ ঢলিয়া

পড়ে, এবং প্রাণের সহিত প্রাণ মিশাইয়া একীভূত হইতে ভালবাসে, তখন উহাকে দ্রব-ঘন অথবা দ্রব পদার্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করিব না কেন?

তোমার চক্ষে ঐ যে জল-ধারা দেখিতেছি, উহা কি? তোমার প্রাণটা কি পরের দুঃখে দ্রব হইয়াছে? তোমার ঐ নয়নের ধারা যদি পর-দুঃখ-কাতরা দয়ারই উচ্ছলিত প্রবাহ হয়, তাহা হইলে তোমার আশে পাশে আর যার প্রাণে দয়ার ঐ রূপ ধারা বহিবে, সে তোমার প্রাণে এক দিন না এক দিন অবশ্যই তাহার প্রাণটা ঢালিয়া দিবে। আর ঐ যে তুমি ঊর্দ্ধনেত্র হইয়া অবশের ন্যায় বসিয়া আছ, এবং ক্ষণে ক্ষণে কার কি ভাবে স্ফুরিত হইয়া, অশ্রুবর্ষণ করিতেছ, তোমারই বা এ অপরূপ ভাব কেন? তোমার প্রাণটা যদি সাগরাভিসারিণী ভাগীরথীর ন্যায়, ভক্তির ধারায়ই প্রবাহিত হইয়া, আজি তোমাকে নয়নজলে ভাসাইয়া থাকে,—তোমার ঐ অনির্ব্বচনীয় আবেশ যদি প্রকৃতই ভক্তির আবেশ হয়, তাহা হইলে তোমার আশে পাশে আর যার প্রাণ ভক্তির টানে এই রূপ দ্রব হইবে, সে এক দিন না এক দিন নিশ্চয়ই তোমার প্রাণে তাহার প্রাণটা ঢালিয়া দিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিবে। ইহা প্রকৃতির অনুল্লঙ্ঘনীয় নিয়ম। তুমিও এই নিয়মের অধীন, সেও সর্ব্বতোভাবেই এই নিয়মের আশ্রিত। তুমি না ডাকিলেও, সে তোমার

কাছে আসিবে, এবং সে না ডাকিলেও, তুমি তাহার কাছে যাইতে বাধ্য হইবে।

পৃথিবীর লোকোত্তর পুরুষেরা যখন, দুঃখদগ্ধ মনুষ্যের উদ্ধার-কামনায় অথবা ভক্তির অনির্ব্বচনীয় আকুলতায় প্রাণে দ্রবীভূত হইয়া, অশ্রু বর্ষণ করেন, তখনও এই হেতুই শত সহস্র লোকের অশ্রুধারা, চারি দিক্ হইতে প্রবাহিত হইয়া, তাঁহাদিগের অশ্রুর সহিত আসিয়া মিলিত হয়, এবং সে সম্মিলিত অশ্রুরাশি, সমুদ্রের জলরাশির ন্যায় উদ্বেল হইয়া, জীব-জগতের দুঃখ-দুর্ভোগ ধুইয়া ফেলায়, অথবা অসংখ্য মনুষ্যের প্রাণের মধ্যে ভগবানের অমৃত-শীতল করুণার ন্যায় অনুভূত হয়।

যে সকল সরলমতি ও সাধুপ্রকৃতি ব্যক্তি, উল্লিখিত ভক্তিসভায় অদ্বৈত আচার্য্যের সহিত সম্মিলিত হইলেন, তাঁহাদিগের মধ্যেও অচিরেই প্রাণে প্রাণে ঐ রূপ একটা মিশামিশি হইল,—যেন প্রত্যেকের প্রাণই প্রেমভক্তির পবিত্র অশ্রুতে পরিণত হইয়া প্রত্যেকের প্রাণ শীতল করিল,—প্রত্যেকের প্রাণে মিশিয়া গেল, এবং সে পিপাসু ভক্তবৃন্দের সম্মিলিতপ্রাণে, ভগবানের নাম-গানে, আনন্দের লহরী উঠিল। কিন্তু ভক্তিসভার এ ভাব নবদ্বীপবাসী বিজ্ঞ যোগ্য পণ্ডিতদিগের নিকট একেবারেই ভাল লাগিল না।

পণ্ডিতদিগের মধ্যে কেহ কাব্যরসে রসিক, কেহ কঠোর

তার্কিক; কেহ বিষয়বৈভবের বণিক্, কেহ বা ঘোরতর বৈদান্তিক। * তাঁহারা সকলেই এই নূতন-প্রতিষ্ঠিত ভক্তিসভার প্রতি সর্ব্বপ্রকারে ঘৃণা ও বিদ্বেষ দেখাইতেন, এবং ভক্তেরা কখন কি করেন, তাহার সমস্ত কথার সংবাদ লইয়া তাঁহাদিগকে নানারূপ শ্লেষ ও পরিহাস করিতেন।

ভক্তেরা, প্রাতে কি সন্ধ্যার পরে, সম্মিলিত হইয়া, হাতে তালি দিয়া নাম-কীর্ত্তন করিতেন। পণ্ডিতেরা বলিতেন, "ইহারা জগদীশ্বরের নাম লইবে ত লউক; কিন্তু কি উদ্দেশ্যে এরূপ উচ্চৈঃস্বরে 'ডাক ছাড়ে', এবং কেনই বা লোক জানাইবার জন্য বড় গলায় হরি হরি বলিয়া ডাকে?" যিনি বেদান্তের পণ্ডিত,—যাঁহার মতে জীব আর ব্রহ্ম এক, এবং 'সোহং ভাব,' অর্থাৎ আমিই সেই জগদীশ্বর এই তত্ত্বই ধর্ম্মের

---

* বেদের অন্তভাগ অর্থাৎ উপনিষদ্ শাস্ত্রের নাম বেদান্ত। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস, সমস্ত উপনিষদের সার কথারে সূত্রের আকারে পরিণত করিয়া, একখানি দর্শনশাস্ত্র প্রণয়ন করেন, তাহার নাম বেদান্ত-দর্শন। শঙ্করাচার্য্য ও রামানুজ প্রভৃতি অনেক বড় বড় পণ্ডিত বেদান্ত-দর্শনের ভাষ্য করিয়াছেন। কিন্তু শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যই সর্ব্বত্র সমধিক-প্রচলিত। যাঁহারা শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যসমেত ব্যাসপ্রণীত বেদান্তসূত্র অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করেন, তাঁহারাই সাধারণতঃ বৈদান্তিক পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত হন। নবদ্বীপে এক সময়ে বেদান্তশাস্ত্র ও বৈদান্তিক পণ্ডিতদিগেরই বিশেষ মহিমা ছিল।

মূলতত্ত্ব, তিনি বলিতেন, "ব্রহ্মত ঘট, পট ও জীবদেহপ্রভৃতি সকল পদার্থেই সমান বিদ্যমান; তবে ইহারা আবার আপনাদিগকে দাস বলিয়া পরিচয় দিয়া, দাস ও প্রভু এই ভেদজ্ঞানে, এরূপ রঙ্গ করে কেন?" পণ্ডিতের মধ্যে যিনি বিষয়ী, তিনি বলিতেন, "ইহারা সকলেইত সংসারী, তবে আবার সংসারে থাকিয়াও পরের ঘরে মাগিয়া খাইবার জন্য ঘুরিয়া বেড়ায় কেন?" যিনি বিদ্যাব্যবসায়ী পণ্ডিত হইয়াও বীর-রসে একটুকু বেশী অনুরক্ত, তিনি বলিতেন, "এত তর্কবিতর্ক এবং আলোচনার আর আবশ্যকতা কি? এ গুলির ঘর দুয়ার ভাঙ্গিয়া ফেলিলেই ত সকল উৎপাত ঘুচিয়া যায়। আমরা তাহা করিয়াই একবারে নিরাপদ হই না কেন?"

ভক্তেরা এ সকল শ্লেষ ও বিদ্রূপের সকল কথাই শুনিতে পাইতেন এবং শুনিয়া যার পর নাই দুঃখিত হইতেন। তাঁহারা প্রিয়মুখে সম্ভাষণ করিতে পারেন এমন একটি মনুষ্যও সভার বাহিরে সমগ্র নবদ্বীপে খুঁজিয়া পাইতেন না। বঙ্গের পুরাতন কবি বৃন্দাবন দাস উল্লিখিত ভক্তিসভার দুঃখ দুরবস্থা বর্ণনা করিয়া বিলাপের করুণ-কণ্ঠে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন,—

"অতি পরমার্থশূন্য সকল সংসার,
তুচ্ছ রস বিষয়ে সে আদর সবার।
গীতা ভাগবত বা পড়ায় যে যে জন,
তাহারাও না বলয়ে কৃষ্ণসংকীর্ত্তন।

হাতে তালি দিয়া সে সকল ভক্তগণ,
আপনা আপনি মেলি করেন কীর্ত্তন।
তাহাতেও উপহাস করয়ে সবারে,
ইহারা কি কার্য্যে ডাক ছাড়ে উচ্চৈঃস্বরে।
আমি ব্রহ্ম আমাতেই বসে নিরঞ্জন,
দাস প্রভু ভেদ বা করয়ে কি কারণ।
সংসারী সকলে বুলে মাগিয়া খাইতে,
ডাকিয়া বলেন হরি লোক জানাইতে।
এ গুলার ঘর দ্বার ফেলাই ভাঙ্গিয়া,
এই যুক্তি করে সব নদীয়া মিলিয়া।
শুনিয়া পায়েন দুঃখ সর্ব্ব ভক্তগণ,
সম্ভাষা করেন হেন নাহি কোন জন।"

কেবল যে নবদ্বীপের পণ্ডিতেরাই ভক্তদিগকে এইরূপ বিদ্বেষ করিতেন, তাহা নহে। নবদ্বীপের আশে পাশে বাহিরের লোকেরাও হরি-নাম-মত্ত ভক্তমাত্রকেই সর্ব্বদা পরিহাস করিত। কবিবর বৃন্দাবনদাস, ভক্তদিগের এই বিড়ম্বনার কথা প্রসঙ্গত পুনরুত্থাপন করিয়া, তদীয় গ্রন্থের আর এক স্থলে লিখিয়াছেন।

"সর্ব্ব দিকে বিষ্ণুভক্তিশূন্য সর্ব্ব জন,
উদ্দেশ না জানে কেহ কেন সংকীর্ত্তন।
কোথায় নাহিক বিষ্ণুভক্তির প্রকাশ,
বৈষ্ণবেরে সবেই করয়ে পরিহাস।

আপনা আপনি সব সাধুগণ মেলি,
গায়েন শ্রীকৃষ্ণ নাম দিয়া করতালি।
তাহাতেও দুষ্টগণ মহাক্রোধ করে,
পাষণ্ডী পাষণ্ডী মেলি ব্যঙ্গ করি মরে।
এ বামুন গুলা রাজ্য করিবেক নাশ,
ইহা সবা হৈতে হবে দুর্ভিক্ষপ্রকাশ।
এ বামুন গুলা সব মাগিয়া খাইতে,
ভাবক কীর্ত্তন করি নানা ছলা পাতে।
গোসাঞির শয়ন বরিষা চারি মাস,
ইহাতে কি জুয়ায় ডাকিতে বড় ডাক।
নিদ্রা ভঙ্গ হইলে ক্রুদ্ধ হইবে গোসাঞি,
দুর্ভিক্ষ করিবে দেশে ইথে দ্বিধা নাই।
কেহ বলে যদি ধান্যে কিছু মূল্য চড়ে,
তবে এ গুলারে ধরি কিলাইব ঘাড়ে।
কেহ বলে একাদশী নিশি জাগরণ
করিব গোবিন্দ নাম করি উচ্চারণ।
প্রতিদিন উচ্চারণ করিয়া কি কাজ,
এই রূপে বলে যত মধ্যস্থ সমাজ।
দুঃখ পায় শুনিয়া সকল ভক্তগণ,
তথাপি না ছাড়ে কেহ হরিসংকীর্ত্তন।"

দোষ কার? যাঁহারা ইতিহাসের গতি লইয়া সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্ম অনুসন্ধান করিতে ভালবাসেন, তাঁহারা অবশ্যই জিজ্ঞাসা

করিবেন যে, দোষের ভাগ কোন্ দিকে বেশী? দোষ কি সম্পূর্ণরূপেই ভক্তিসভার বহির্ভূত বিষয়িপণ্ডিতদিগের? এ কথার দুই দিকেই সমান কাঁটা। এ প্রশ্নের উত্তর করিতে যাওয়া প্রকৃতই বড় কঠিন। মনুষ্য, এই পৃথিবীর কোথাও কোন কালে সম্প্রদায়বদ্ধ না হইয়া, মানবজাতির হৃদয়সঞ্চালন অথবা মনুষ্যের মঙ্গলজনক বৃহৎ কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারে নাই। অথচ, ইহাও সত্য যে, যাঁহারাই যখন যেখানে, যত দূর সম্ভব উচ্চ প্রয়োজনে, সম্প্রদায়বদ্ধ হইয়া কার্য্য করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহারাই তখন সেখানে, উদারতার অভাবের নিমিত্ত উপেক্ষিত, এবং অভিমান অথবা তাদৃশ কেমন একটুকু তিক্ত ও তীব্র ভাবের আতিশয্যহেতু দশ জনের কাছে অনাদৃত হইয়াছেন।

এখানে এ কথা প্রসঙ্গে মনুষ্যপ্রকৃতির একটি নিগূঢ় রহস্য আলোচনার বিষয় হইতেছে। মনুষ্য সকল সহিতে পারে; কিন্তু মনুষ্যচরিত্রে সাধারণ হইতে কোন অংশেও পার্থক্যের কোন রূপ ভাব সহ্য করিতে পারে না। যদি কেহ জ্ঞানে একটুকু বড়, গুণে একটুকু উজ্জ্বল, অথবা কোন কোন মনোবৃত্তির উচ্চতর বিকাশে প্রতিভান্বিত হইয়া, আপনার অন্তর-নিহিত তত্ত্বের ভারে কিংবা আপনার সে অনন্যসাধারণ ভাবে, আপনি একটুকু পৃথক্ থাকেন, তাহা হইলে দশ জনেই তাঁহাকে পর মনে করে,—দশ জনেই তাঁহার

প্রতি বিদ্বিষ্ট রহে। তিনি যদি কর্ম্মজীবনে আপনার উচ্চ-সঙ্কল্পের অনুরূপ কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে না পারিয়া মনের দুঃখে ম্রিয়মাণ রহেন, সাধারণ লোকে, তাঁহার সে নীরব-গাম্ভীর্য্য ও কাতর ভাবকেও উদারতার অভাব অথবা কঠোর অভিমান বলিয়া মনে ঠাউরাইয়া লয়, এবং তাঁহার প্রতি বিকার ও বিদ্বেষ পোষণ করে।

ইহাতে দৃষ্ট হইতেছে যে, দোষ কাহারও ইচ্ছাকৃত নহে, অথচ দোষের ভাগ দুই দিকেই সমান। কেন না, প্রকৃত দোষ মনুষ্যহৃদয়ের স্বাভাবিক দুর্ব্বলতায়। যাঁহারা বড়, তাঁহাদিগের দোষ এই যে, তাঁহারা ছোটকে তাঁহাদিগের হৃদয়ের ভাগী করিয়া লইতে পারেন না—অথবা হৃদয়-সম্পদের ভাগ দিতে ভালবাসেন না। ইহা প্রকৃতই অতি গুরুতর দোষ। যে এইক্ষণ ছোট রহিয়াছে, সে কালে বড় হইবে। যাহাকে এইক্ষণ অঙ্কুরমাত্র জ্ঞানে অবজ্ঞা করিতেছ, সে কালে বড় একটা বৃক্ষ হইয়া উঠিবে। তবে আর এ ছোট-বড় পার্থক্যের এইরূপ সূক্ষ্ম বিচার কেন? অপিচ, সে যদি তাহার কর্ম্মদোষে অথবা দুর্ভাগ্যবশতঃই ছোট হইয়া থাকে, তাহা হইলেও তাহাকে বাড়াইয়া লওয়াই তোমার বিশেষ কার্য্য। নতুবা তুমি একাকী বড় হইলে সংসারের তাহাতে উপকার কি? যে যত বড়, তাহার তত বেশী দায়িত্ব। সে যদি তাহার দায়িতার গুরুত্ব অনুভব করিয়া

সাধারণের সঙ্গে মিশিতে না পারিল, তবে তাহার ঐরূপ বড় হওয়ায় সার্থকতা কি? পক্ষান্তরে, যাহারা ছোট, তাহাদিগের এই দোষ যে, তাহারা উচ্চতর পুরুষদিগের হৃদয়ের উচ্চসীমা পর্য্যন্ত উঠিতে পারে না। তাহারা দলবদ্ধ হইয়া দূরে রহে,—দূরে—দিবাভীতের ন্যায় অভীপ্সিত অন্ধকারে রহিতে পারিলেই আপনাদিগকে আপনারা সুখী মনে করে,—অথচ সে উচ্চতা যদি তাহাদিগের কাছে অতি উপাদেয় বর্ণে চিত্রিত হয়, তথাপি তাহারা কাছে যাইয়া পরখ করিতে চাহে না। দুইয়ের মধ্যে এই হেতুই পার্থক্যের একটা রেখা পড়ে; এবং যেখানে পার্থক্যের ভাব প্রবল, সেখানে স্বভাবতঃই উদারতার অভাব ঘটে। ঐরূপ পার্থক্য যখন আবার ব্যক্তিবিশেষের উচ্চক্ষমতায় নিবদ্ধ না রহিয়া, কোন একটি বিশেষ মত কিংবা বিশেষ ভাবের অনুরোধে জনে জনে নিবদ্ধ হয়, এবং একটি সুগঠিত সম্প্রদায়ের মূর্ত্তি ধারণ করে, তখন যে একে অন্যকে সর্ব্বতোভাবে অবিশ্বাস করিবে, ইহাতে আশ্চর্য্যজ্ঞানের বিষয় কি?

নবদ্বীপের ভক্তিসভা, সম্ভবতঃ এই সকল কারণেই, তত্রত্য সাধারণ সমাজ হইতে একবারে পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছিল। সাধারণ সমাজ পূর্ব্ব হইতেই ভক্তিদ্বেষী; কিন্তু যখন নবসম্মিলিত ভক্তবর্গ, আপনাদিগের সে পৃথগ্‌ভাবে দৃঢ় হইয়া, ভক্তির একটুকু বেশী আন্দোলন করিতে লাগিলেন, তখন

বহিঃস্থ ব্যক্তিদিগের বিদ্বেষের ভাব চতুর্গুণ বাড়িয়া উঠিল; এবং ভক্তেরা চারি দিকের উৎপীড়নে চিত্তে একবারে অবসন্ন হইয়া হাহাকার করিতে লাগিলেন।

কিন্তু, মেদিনী যখনই নিদাঘ দাহে দগ্ধ হইয়া, পিপাসায় আকুল হয়, জগন্ময়ী প্রকৃতি তখনই জল-ধারা বর্ষণ করিয়া উহার সে দুঃখ অংশতঃ কিংবা সম্পূর্ণরূপে দূর করিয়া থাকেন। নবদ্বীপের ভক্তবৃন্দও তাঁহাদিগের সে দুঃখদাহের সময়ে অকস্মাৎ একটুকু শান্তি লাভ করিলেন। তাঁহারা চারি ধারে ঘোরতর অন্ধকার দেখিয়া ভগবানের দিকে চাহিয়াছিলেন। ভগবানের কৃপায় তাঁহাদিগের মধ্যে সহসা একটি প্রশান্ত ও প্রফুল্ল আলোক-স্তম্ভ আবির্ভূত হইল। তাঁহারা সংসারকে শূন্য মনে করিয়া দুঃসহকষ্টে দিনপাত করিতেছিলেন; ভগবানের কৃপায় সহসা তাঁহারা একটি সমুচ্ছ্রিত ভক্তের ছায়া পাইয়া শীতল হইলেন। যথা, বৃন্দাবন-দাসের ভাগবতে,—

"শূন্য দেখি ভক্তগণ সকল সংসার,
হা কৃষ্ণ বলিয়া দুঃখ ভাবেন অপার।
হেন কালে তথায় আইলা হরিদাস,
শুদ্ধ বিষ্ণুভক্তি যাঁর বিগ্রহ প্রকাশ।"

ভক্তেরা সে মহাতেজোময় অথচ মধুর, সে উজ্জ্বল অথচ আনন্দস্নিগ্ধ মূর্ত্তি দেখিয়াই, মনে এই ভাবিয়া আশ্বস্ত হই-

লেন যে, তাঁহারা এত দিনের পর উদারপ্রকৃতি উন্নত পুরুষের আশ্রয় পাইয়াছেন। ভক্তিসভা, ক্ষীণ-জলা স্রোতস্বিনীর ন্যায়, কিছু দিন নিতান্ত মৃদু বহিতেছিল; হরিদাসের সমাগমে উহা নবজীবন লাভ করিল,—যেন আর একটি প্রবল ধারার সম্মিলনে উহাতে নূতন তরঙ্গ ছুটিল। নবদ্বীপের অনেকেই ভক্তিসভার কল কল ধ্বনি শুনিয়া আবার সে দিকে কান দিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ভক্ত হরিদাস।

ফুটন্ত পদ্ম ও অস্ফুট গোলাপ, বিশাল বট, বিনোদ-মধুর ছায়াময় বকুল, ইহারা সকলেই ত খুব বেশী সুন্দর। কিন্তু ইহাদিগের কোন্‌টির মধ্যে সৌন্দর্য্যের কি রূপ আভা নিহিত রহিয়াছে, তাহা সম্যক্ বুঝিতে পারি কি? মনুষ্যের মুখশ্রী-তেও সৌন্দর্য্যের এই রূপ অনন্ত বৈচিত্র্য আছে। কাহারও সৌন্দর্য্য স্নেহের ন্যায় কোমল; দেখিলেই বোধ হয় যে, স্নেহ বুঝি ঐ মুখখানিতে মূর্ত্তিবদ্ধ হইয়া মানুষের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। কাহারও সৌন্দর্য্য প্রীতির ন্যায় মধুর; দেখিলে মনে হয়, যেন নয়নের প্রত্যেক পলকে প্রীতির অমিয়-মধু উছলিয়া উছলিয়া পড়িতেছে। বস্তুতঃ, প্রীতি, ভক্তি এবং স্নেহ ও দয়া প্রভৃতি প্রত্যেক মনোবৃত্তিরই পৃথক্ একটি ভাষা ও পৃথক্ একটি রূপ আছে। সে ভাষার অর্থ-গ্রহ ও সেই চিত্তপ্রতিবিম্বি রূপের উপাসনাই প্রকৃত কাব্যের প্রধান সম্পদ। হরিদাসেরও অমনই একটু রূপ ছিল এবং সে রূপে কথা ফুটিত,—রূপের ভাষা সকলকেই যেন ডাকিয়া সম্ভাষণ করিত।

হরিদাস যখন ভক্তিসভায় প্রথম সমাগত হইলেন, তখন সকলেই তাঁহার শান্ত, সুস্থির ও শীতল রূপ দেখিয়া, তাঁহার দিকে তাকাইলেন,—তাঁহাকে ঔৎসুক্যের সহিত দেখিতে

লাগিলেন। অদ্বৈতের সহিত হরিদাসের শান্তিপুরের বাড়িতে পূর্ব্বেই বিশেষ প্রেম পরিচয় ও সুখ-সৌহার্দ্দ ঘটিয়াছিল। অদ্বৈত তাঁহাকে প্রাণের সুহৃদ্ বলিয়া জানিতেন। তিনি সেই ভাবে তাঁহার আদর ও অভ্যর্থনা করিলেন। আর আর সকলে, আগন্তুকের ভাবভঙ্গী দেখিয়া, একটুকু বিস্মিত হইলেন। আগন্তুকের সুন্দর আকৃতি দেখিয়াও সকলেই শ্রদ্ধার ভাবে আদর করিলেন।

তবে হরিদাস কি বড় সুপুরুষ ছিলেন? বৃন্দাবনদাস তাঁহার রূপ বর্ণনায় লিখিয়াছেন,—

"আজানুলম্বিত ভুজ কমল নয়ন,
সর্ব্বোমনোহর মুখ চন্দ্র অনুপম।"

কবিরাজ গোস্বামীও তাঁহাকে একস্থলে "পরম সুন্দর যুবা" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাতে বোধ হয় যে, হরিদাস নাক,মুখ ও চক্ষু * প্রভৃতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সাধারণ সৌন্দর্য্যেও একবারে বঞ্চিত ছিলেন না। কিন্তু যে সৌন্দর্য্যকে সহৃদয় ব্যক্তিরা ভগবদ্ভক্ত ও প্রীতিমান্ মনুষ্যের অসাধারণ সম্পদ বলিয়া মনে করেন, হরিদাস আত্মার সে অমল অপূর্ব্ব-সৌন্দর্য্যে, সর্ব্বদা ও সকল স্থলেই, মনুষ্যের হৃদয় ও মন আকর্ষণ করিতেন। তাঁহার সহিত যাহার পরিচয় হইত,

---

* মনঃ যশঃ জ্যোতিঃ স্রোতঃ এবং চক্ষুঃ প্রভৃতি বিসর্গান্ত শব্দের অন্ত্য বিসর্গ বাঙ্গালায় সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয় না।

সেই তাঁহাকে একটি উচ্চশ্রেণির মনুষ্য বলিয়া মনে করিত। মনে করিত ঐ মূর্ত্তিখানি বুঝি অন্তরের সহিত তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছে; এবং উহার ললাটে ভক্তি ও প্রীতির যে প্রশান্ত জ্যোতি প্রতিফলিত হইতেছে, তাহা বুঝি তাহার প্রাণে পশিতেছে। ভক্তিসভার সমস্ত সভ্যই মনে মনে এই রূপ বুঝিলেন; এবং বুঝিয়া হরিদাসকে সকলেই আপনা-দিগের এক জন উপদেষ্টা, অভিভাবক ও আনন্দপ্রদ সুহৃদ্ জ্ঞানে অভিবাদন করিলেন।

হরিদাসের জীবনবৃত্তান্ত ঐ সময়ে বঙ্গদেশের অনেক স্থলেই আলোচনার একটা বিশেষ বস্তু হইয়াছিল। নবদ্বীপ ও শান্তিপুর প্রদেশের সকলেই তাঁহার কথা লইয়া নানারূপ বাদবিতর্ক করিত। যাহাদিগের মনে অনুরাগ কিংবা বিরা-গের বিশেষ ভাব ছিল না, তাহারাও তাঁহাকে নামতঃ জানিত। ভক্তিসভার সদস্যবর্গও হরিদাসকে নামতঃ জানি-তেন। তাঁহারা অদ্বৈতের কাছে হরিদাসের প্রসঙ্গে অনেক কথা শুনিয়াছিলেন। অন্যান্য লোকের কাছেও তদীয় আশ্চর্য্য জীবনের অনেক অসাধারণ বিবরণ অবগত হইয়া-ছিলেন। সুতরাং হরিদাসকে তাঁহারা এই প্রথম দেখিয়াও প্রথমপরিচিতবৎ মনে করিলেন না। পূর্ব্বপরিচিত মহাজন জ্ঞানে সকলেই তাঁহাকে সম্মান করিয়া সুখী হইলেন।

হরিদাস সম্পর্কে একটা বিষয়ে তাঁহাদিগের চিত্তে বড়

বেশী সংশয় ছিল। তাঁহারা শুনিয়াছিলেন যে, হরিদাস জাতিতে যবন; অথচ যবন হইয়াও জ্ঞানে ও ধর্ম্মে এবং আকৃতির মহত্ত্বে ও প্রকৃতির মধুরতায় ব্রাহ্মণ হইতে শ্রেষ্ঠ। এ কথাটা অনেকে ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেন না—অনেকে বুঝিয়াও বিশ্বাস করিতে চাহিতেন না। কিন্তু সেই যবন—হিন্দু,—সেই শিষ্যভাবাপন্ন গুরু,—সেই নীচবংশোদ্ভব নির্ম্মল ঋষি,—সেই নিরভিমান ভক্ত-পণ্ডিত যখন তাঁহাদিগের কাছে আসিয়া দীন-হীনের মত দণ্ডায়মান হইলেন, তখন সকলেই হরি হরি বলিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন দিলেন,—অনেকে তাঁহার কাছে মাথা নোয়াইলেন।

যবন-হিন্দু এ কথাটা ভারতবর্ষের ইতিহাসে বড়ই অভাবনীয়। অভাবনীয় বলিয়াই উহা অনেকের কাছে শ্রুতিকটু বোধ হইতে পারে। কিন্তু কথাটা সত্য এবং ভক্তিধর্ম্মের প্রকৃত গৌরবসূচক।

মনুষ্যপ্রকৃতির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোষ সকল যেমন বৃহৎ একটা দোষের সঙ্গ লয়, এবং সেই বৃহৎ দোষের সঙ্গে এক সূতায় গাঁথা হইয়া সংসারে কার্য্য করে; গুণনিচয়ও সেইরূপ বৃহৎ একটা গুণের সঙ্গ লয়,এবং সেই বৃহৎ গুণের সহিত এক সূতায় গ্রথিত হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রতিফলিত রহে। * হরিদাসের

---

* যথা, কালিদাসকৃত রঘুবংশকাব্যে দিলীপের গুণবর্ণনায়,—

"গুণা গুণানুসন্ধিত্বাৎ তস্য সপ্রসবা ইব"

চরিত্ররূপ চারুগ্রথিত রত্নমালায় ভক্তিই মধ্যমণি।* অথচ, সেই ভক্তির দুই দিকেই অন্যান্য বহুবিধ গুণ সর্ব্বদা উজ্জ্বলকান্তিতে শোভা পাইত; † এবং শত্রু মিত্র সকলেই একাধারে এত গুণের সমাবেশ দেখিয়া, তাঁহাকে একটি অসাধারণ পুরুষ জ্ঞানে সম্মান করিত। কিন্তু হরিদাস যবন-হিন্দু এই কথাটা তাঁহার অসংখ্য গুণরাশিকেও অতিক্রম করিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, এবং হিন্দু ও যবন উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই তাঁহার জীবনের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সমস্ত ঘটনাকে আলোচনা ও বাদ-বিতর্কের একটা বিশেষ সামগ্রী করিয়া তুলিয়াছিল।

---

* অর্থাৎ,—তাঁহার প্রত্যেক গুণই গুণান্তরের সহিত এমন সম্পৃক্ত ছিল যে, একটি যেন আর একটি হইতে প্রসূত হইয়াছিল।

† যথা, শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণের পঞ্চম স্কন্ধে,—

"যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্ব্বৈগুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ।"

অর্থাৎ,—ভগবানে যাঁহার অকিঞ্চনা ভক্তি জন্মে, দেবতাদিগের সমস্ত গুণ তাঁহাতে আসিয়া বসতি করে। পক্ষান্তরে, ভগবান্ হরিতে যাহার ভক্তি নাই, তাহার প্রকৃতিতে কোন রূপ মহৎ গুণ প্রতিফলিত হয় না; কেন না, সে তাহার মনোরথে আরূঢ় হইয়া অসদ্বিষয়ের অন্বেষণে বাহিরেই প্রধাবিত রহে।

হরিদাসের সাত শত বৎসর পূর্ব্ব হইতে ভারতে মুসলমান-যবনের পরাক্রম প্রতিষ্ঠিত ও অত্যাচারের স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে, এবং এই সাত শত বৎসরে অতি কম হইলেও সাত লক্ষ হিন্দু, জীবনরক্ষার উদ্দেশ্যে, যবনধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। যাহারা মূর্খ, দরিদ্র অথবা নিরাশ্রয়, তাহাদিগের ত কথাই নাই। হিন্দুর মধ্যে যাঁহারা পণ্ডিত, সমৃদ্ধ ও অসংখ্য অনুজীবিদ্বারা পরিরক্ষিত, এমনও শত শত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, উল্লিখিত সাত শত বৎসরের মধ্যে, যবনের কাছে জাতি বিক্রয় করিয়া কলমা পড়িয়াছে। কিন্তু যবন হিন্দু হইয়াছে,—যবন-সম্রাট্ ও যবন রাজাদিগের অসংখ্য তরবারির উন্মুক্ত জিহ্বাকে অতিক্রম করিয়া কোন স্থানে কোন যবন হিন্দু হইতে পারিয়াছে, ইহা কেহ চক্ষে দেখে নাই, কানে শুনে নাই। হরিদাসই এ অতুল ও অসম্ভাবিত পুরুষকারের,—ভক্তির এই রূপ সর্ব্বজয়িনী ক্ষমতার প্রথম নিদর্শন। তিনিই হিন্দু ও যবন উভয় জাতিকে ইহা সর্ব্বপ্রথম চক্ষে দেখাইলেন ও নানা স্থানে নানা প্রসঙ্গে হরিনাম গাইয়া সর্ব্বপ্রথম কানে শুনাইলেন। সুতরাং তাঁহার নামমাত্র শ্রবণেই সকল স্থানে যে একটা হল-হলা পড়িত, তাহাতে বিস্ময়ের কথা কি আছে?

অপিচ, হিন্দুধর্ম্ম চিরকালই যবনের অনধিগম্য। পঙ্গু পর্ব্বত লঙ্ঘন করিতে পারে, তথাপি যবনাদি কোন জাতিই হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণে করিতে অধিকারী হয় না। ইহাই হিন্দুর

শাস্ত্রের কথা। ইহাই সত্য ত্রেতা ও দ্বাপর হইতে সমস্ত হিন্দুর হৃদয়ের সিদ্ধান্ত। কিন্তু শাস্ত্রের এরূপ কঠোর বিধি এবং সমাজের এরূপ কঠিন শাসন সত্ত্বেও যবন হরিদাস প্রকৃতপ্রস্তাবে হিন্দু হইয়াছিলেন, এবং বহুসংখ্য হিন্দুর নিকট ঠাকুর বলিয়া পূজা পাইয়াছিলেন। সুতরাং তিনি যেখানে যাইয়া উপস্থিত হইতেন, তাঁহাকে দেখিবার জন্য সেখানেই যে লোকের একটা ভয়ানক ভিড় হইত, এবং সকল লোকের মনেই অত্যধিক কৌতূহল জন্মিত, ইহাতে বিস্মিত হইবার বিষয় কি?

বস্তুতঃ, এক দিকে তখনকার সে দুরন্ত যবনের অস্ত্র, আর এক দিকে হিন্দুর চিরসম্মানিত শাস্ত্র;—এক দিকে যবনের আহত অভিমান, আর এক দিকে হিন্দুর আশঙ্কিত সামাজিক সম্মান;—এক দিকে যবনের দুর্জ্জয় ক্রোধ,—আর এক দিকে হিন্দুর ক্রিয়া-সূত্র-বদ্ধ কঠোর সংস্কার; হরিদাস যখন দুই দিকের এই দুই প্রবল স্রোতের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া হরিনাম কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন মনুষ্য প্রকৃতই একটা নূতন দৃশ্য দর্শন করিয়া চিত্তে স্তম্ভিত হইল। হিন্দুর মধ্যে যাঁহারা প্রগাঢ় ভক্ত, তাঁহাদিগের মনে এই প্রতীতি হইল যে, ইহা ভগবানের প্রত্যক্ষলীলা, এবং ইহাই ভক্তির জয়। কৃষ্ণাশ্রিত ভক্তিধর্ম্মে এই রূপ উপদেশ আছে যে,—

"চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তিপরায়ণঃ
হরিভক্তিবিহীনস্তু দ্বিজোঽপি শ্বপচাধমঃ।"

অর্থাৎ,—চণ্ডালও যদি হরিভক্তিপরায়ণ হয়, তাহাকে শ্রেষ্ঠব্রাহ্মণ বলিয়া মনে করিবে; এবং যে ব্রাহ্মণ হরিভক্তি-শূন্য, তাহাকে কুক্কুর-মাংসভোজিদিগের মধ্যেও অধম বলিয়া জানিবে।

অপিচ,—

"ভক্তিরষ্টবিধা হ্যেষা যস্মিন্ ম্লেচ্ছেঽপি বর্ত্ততে
স মুনিঃ সত্যবাদী চ কীর্ত্তিমান্ স [illegible]নরঃ।"

অর্থাৎ,—যদি কোন ম্লেচ্ছও এই অষ্টবিধ ভক্তিতে অলস্কৃত হয়, তাহা হইলে সেই সত্যপরায়ণ কীর্ত্তিমান্ ব্যক্তি মনুষ্যের মধ্যে মুনির আসন প্রাপ্ত হন।

যাঁহারা ভক্তিমান্ সাধু, তাঁহাদিগের মনে লইল যে, ভক্তি-শাস্ত্র, পুরাতন ক্রিয়াশাস্ত্রকে উল্লঙ্ঘন করিয়া, এত দিনে সম্পূর্ণরূপ সফল হইল।

কিন্তু, হিন্দুদিগের মধ্যে অনেকেই হরিদাসকে এই রূপ সম্মান করিত বলিয়া তিনিও কি আপনাকে আপনি হিন্দু বলিয়া খ্যাপন করিতেন, এবং আপনার হিন্দুত্ব ও ভক্তি-নিষ্ঠার ব্যাখ্যান করিয়া হিন্দুসমাজে প্রবিষ্ট হইতে চাহিতেন? তাঁহাতে এই রূপ আত্মাভিমানের অণুমাত্রও পরিলক্ষিত হইত

না। লোকে তাঁহাকে ভক্ত বলিয়া সম্মান করিতে যাইত তিনি কাহারও ব্যবহারে সম্মাননার সামান্য লক্ষণ দেখিলে ভয়ে জড় সড় হইয়া দূরে সরিয়া পড়িতেন। হিন্দুরা তাঁহাকে আদর করিয়া অন্নব্যঞ্জন দিতেন; তিনি সে অন্নব্যঞ্জন ভগবানের প্রসাদান্ন জ্ঞানে মাথায় ছোঁয়াইয়া বাড়ির বাহিরে যাইয়া খাইতেন। তাঁহার এই অকৃত্রিম নম্রতা দর্শনেই সকলে তাঁহাকে অধিকতর শ্রদ্ধা করিত, এবং তিনি তাহা হৃদয়ে অনুভব করিয়া অধিকতর নত রহিতেন। বৈষ্ণব-কবিরা সকলেই তাঁহাকে ঠাকুর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহাতে যদি ষ . ও খাটি সোনা না থাকিত, তাহা হইলে তাঁহার ঠাকুরালি কখনই লোকের হৃদয় ও মনকে আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইত না।

বর্ত্তমান সময়ের কোন কোন বিজ্ঞ লেখক এই রূপ অনুমান করেন যে, হরিদাস জাতিতে ব্রাহ্মণ। * তিনি ব্রাহ্মণের

---

* ভক্তিনিধি শ্রীযুক্ত অচ্যুত চরণ চৌধুরী তদীয় শ্রীমৎ হরিদাস ঠাকুরের জীবনচরিত নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, "হরিদাস হিন্দুসন্তান। তাঁহার মাতার নাম গৌরী দেবী এবং পিতার নাম সুমতিশর্ম্মা। জন্মস্থান বুড়ন।" আরও লিখিয়াছেন যে "এ কথা প্রাচীন শিব-গীতা গ্রন্থে, (সংস্কৃত তন্ত্র) ভগীরথবন্ধুকৃত চৈতন্য সঙ্গীতায় এবং উদ্ধব প্রণীত হরিনামামৃত-লহরী-গ্রন্থে পাওয়া যায়।" পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক উদ্ধৃত কবি জয়ানন্দ কৃত চৈতন্য মঙ্গল অনুসারে "হরিদাস

কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া পিতৃহীন অবস্থায় যবন হইয়াছিলেন, এবং তার পর পুনরায় জ্ঞানোদয়ে হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ভক্তির পথ লইয়াছিলেন। এ অনুমান প্রকৃতপ্রস্তাবে বৃত্তান্ত-মূলক নহে। অপিচ, ইহা প্রামাণিক লেখার বিরুদ্ধ।

ঠাকুরের মাতার নাম উজ্জ্বলা, পিতার নাম মনোহর। তিনি গঙ্গাতীরে কলাগাছি গ্রামে (ভাট বংশে) হীন কুলে জন্ম গ্রহণ করেন।" ঠাকুর হরিদাসের জন্মপ্রসঙ্গে পরবর্ত্তী লেখক দিগের এরূপ পরস্পর-বিরুদ্ধ বিবিধ কথার দ্বারা, স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে, হরিদাসের নাম যখন দেব-পুরুষের নামের ন্যায় বঙ্গের গৃহে গৃহে উচ্চারিত ও প্রচারিত, তদানীন্তন ভক্ত কবিরা কেহই তখন আর হরিদাসকে যবন-কুল সম্ভূত বলিয়া চিত্তে অবধারণ করিতে সাহস পা[illegible] নাই। হরিদাসের অবতারত্ব সম্বন্ধেও সেই কথা। তাঁহাকে কেহ বলিয়াছেন ব্রহ্মার অবতার, কেহ বলিয়াছেন প্রহ্লাদের অবতার। কিন্তু ঈশান নাগর উভয় প্রকার কল্পনার গৌরব রক্ষা করিয়া তদীয় গুরুদেব শ্রীমৎ অদ্বৈত আচার্য্যের উক্তিকে প্রমাণ স্বরূপ উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন, হরিদাস একই দেহে এক-আধারে ব্রহ্মা ও প্রহ্লাদের মিলিত অবতার। যথা ঈশান-বিরচিত অদ্বৈত প্রকাশে,—

"ত্রয়োদশ শত দ্বিসপ্ততি শকমিতে,
প্রকট হইলা ব্রহ্মা বূঢ়ন গ্রামেতে,
কেহ কহে হরিদাসে প্রহ্লাদাব[illegible],
প্রভু কহে দোঁহে [illegible] হয় এ[illegible]।"

যশঃখ্যাত হরিদাসঠাকুরের জন্ম, জন্ম স্থান, [illegible] এবং জন্মের মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে ভক্তির এই রূপ বিবিধ কল্পনা কোন অংশেও

প্রামাণিক কবি বৃন্দাবনদাস হরিদাস ঠাকুরের জন্ম প্রসঙ্গে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে অনুমান অথবা বাদবিতর্কের আর স্থল থাকে না।—

"জাতি কুল সব নিরর্থক বুঝাইতে,
জন্মিলেন নীচকুলে প্রভুর আজ্ঞাতে।
অধম কুলেতে যদি বিষ্ণুভক্ত হয়,
তথাপি সেই সে পুজ্য সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
উত্তম কুলেতে জন্ম শ্রীকৃষ্ণ না ভজে,
কুলে তার কি করিবে নরকেতে মজে।
এই সব বেদবাক্য সাক্ষী দেখাইতে,
জন্মিলেন হরিদাস অধম কুলেতে।"

বিস্ময়াবহ নহে। কিন্তু, এ সকল কথা শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের সমসাময়িক অথবা সন্নিহিত কালবর্ত্তী লেখক দিগের মধ্যে কোন অংশেও পরিজ্ঞাত থাকার প্রমাণ পাওয়া যায় না। আমি এই হেতু এবং আরও নানা কারণে, ঠাকুর বৃন্দাবন দাস এবং কবিরাজ গোস্বামীকে অতিক্রম করিয়া নব্য প্রকাশিত গ্রন্থপত্রের আশ্রয় লইতে সাহস পাই নাই। অপিচ, ভক্তির বিশ্ববিজয়িনী শক্তি প্রদর্শনই আমার এই ক্ষুদ্র পুস্তকের মুখ্য উদ্দেশ্য। "যবন হরিদাস" কি রূপে ভক্তির মহিমায় মহোচ্ছ্রিত ব্রাহ্মণ দিগেরও পূজা পাইয়াছেন, ইহাই বুঝাইতে যত্নপর হইয়াছি। কিন্তু তিনি জন্ম-সম্পর্কে যবন,—না শৈশবে জাতিভ্রংশ-হেতু যবন বলিয়া পরিচিত, এই কথা লইয়া এ পুস্তকে বিচার বিতর্ক করা আবশ্যক বোধ করি নাই।

বৃন্দাবনদাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী এবং ভক্ত-মালের অনুবাদক কৃষ্ণদাস বাবাজি প্রভৃতি বড় বড় বৈষ্ণব-কবি অশেষবিশেষে হরিদাসের গুণানুবাদ করিয়াছেন,—হরিদাসের প্রতি হৃদয়ের ভক্তি দেখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহারা হরিদাসের দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় পুরুষের সমসাময়িক লোক। হরিদাসের সকল কাহিনীই তাঁহারা লোক-পরম্পরায় জ্ঞাত হইয়াছিলেন। তাঁহারা যদি ঘুণাক্ষরেও এইরূপ জানিতেন যে, হরিদাস ব্রাহ্মণের ঘরে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা হইলে সে কথা তাঁহারা শত প্রকারে বর্ণনা করিতেন, এবং ব্রাহ্মণ-শিশু, যবনের হস্তে জাতিভ্রষ্ট হইয়াও, কিরূপে পুন-রায় হরিনামের মহিমায় স্বসমাজে ও ভক্তমণ্ডলীতে প্রবিষ্ট হইল, তাঁহারা তাহা উৎসাহ ও অভিমানের সহিত লিপিবদ্ধ করিতেন। কিন্তু তাহা করা দূরে থাকুক, তাঁহারা সকলেই যখন একবাক্যে বলিয়া গিয়াছেন যে, হরিদাস জগতে জাতিকুলের নিরর্থকতা দেখাইবার জন্য নীচবংশে জন্মিয়া-ছিলেন, তখন কেমন করিয়া তাঁহাদিগের সে সাক্ষ্য ঠেলিয়া ফেলিব?

ফলতঃ, হরিদাস জাতিতে ভক্ত অথবা ভক্তজাতীয় শ্রেষ্ঠ জীব। তিনি মানবসমাজের যে জাতিতেই জন্মিয়া থাকুন, মনুষ্য তাঁহাকে, তাঁহার প্রথম বয়স হইতেই, পাপ-স্পর্শ-শূন্য ব্রাহ্মণ জ্ঞানে পূজা করিয়াছে, এবং ভগবানের এই বিশ্বরাজ্যে

ভক্তির যদি কোন মহিমা অথবা গৌরব থাকে, তাহা হইলে ঠাকুর হরিদাসের মত ব্যক্তিদিগের এই রূপ পূজা চিরকালই প্রতিষ্ঠিত রহিবে।

নবম পরিচ্ছেদ।

হরিদাসের প্রথম বয়স।

এ দেশের বালক ও বৃদ্ধ সকলেই প্রহ্লাদের নাম শুনিয়াছেন। বস্তুতঃ প্রহ্লাদ-চরিত্রের পুরাতন কাহিনী, ভারতীয় অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে, ঘনীভূত অমৃতরাশি। সমীরণ যেমন, স্থানে স্থানে, কুসুমের সৌরভে সুরভি হইয়া, সর্ব্বত্রই আনন্দ দান করে, এবং যাহার শরীরে সে অবস্থায় স্পৃষ্ট হয়, তাহারই প্রাণ জুড়ায়; ভাষাও সেইরূপ, সময়ে সময়ে, প্রেম-ভক্তিময় ও পরোপকার-ব্রত-প্রধান পুরুষদিগের জীবনের সৌরভে সুরভি হইয়া, সর্ব্বত্র সুখ-শান্তি বিতরণ করে, এবং যাহার হৃদয়ে সে অবস্থায় প্রবিষ্ট হয়, তাহাকে পৃথিবীতেই স্বর্গের ভাবে বিহ্বল করিয়া রাখে। ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত ভাষাই, এক সময়ে, মানুষের দুয়ারে দুয়ারে প্রহ্লাদের কথা কহিয়াছিল,—প্রহ্লাদের গীত গাইয়াছিল, এবং অনেককে প্রহ্লাদের ভাবে, অল্প কিংবা অধিক পরিমাণে, বিভোর রাখিয়াছিল। বোধ হয়, সে ভাবের একটা প্রবল ঢেউ বঙ্গদেশে আসিয়া পঁহুছিয়াছিল। নহিলে, প্রহ্লাদের সে অতীতজীবন বঙ্গে নূতন মূর্ত্তিতে প্রতিবিম্বিত হইবে কেন?

প্রণতচিত্ত ও পরার্থপর হরিদাস বঙ্গদেশের প্রহ্লাদ। তেমনই সরল, তেমনই শিষ্ট, তেমনই নিরভিমান শিশু, তেমনই নিঃশঙ্ক বীর। কাহারও প্রতি বিকার নাই, কাহারও

প্রতি বিদ্বেষ নাই,—যে প্রাণের উপর আঘাত করিতে যাই-তেছে, তাহার প্রতিও মন্দভাব নাই; অথচ, আপনার হৃদয়-নিহিত ভক্তিকে অক্ষুণ্ণ রক্ষা করিবার জন্য সশস্ত্র শক্রর নিকটেও পর্ব্বতের ন্যায় অটল,—চারিদিকে বিষ-সর্পের গর্জ্জন হইতেছে, তাহার মধ্যেও আপনার আনন্দময় মধুর ভাবে আপনি বিহ্বল। তিনি পৌরাণিক প্রহ্লাদের মত রাজা কিংবা মহারাজের ঘরে জন্ম গ্রহণ করেন নাই বটে; কিন্তু তাঁহার প্রফুল্ল হৃদয়ে জন্মাবধিই ভক্তিজনিত মহাভাবের একটি জ্যোৎস্না-শীতল মহারাজ্য লুক্কায়িত ছিল।

ইহা অস্বাভাবিক অথবা কোন অংশেও অসম্ভব নহে। যাঁহারা জ্ঞানের আত্মা লইয়া জন্ম গ্রহণ করেন, তাঁহারা শৈশবেই সাধারণের অনধিগম্য তত্ত্বসকল, শুধু বুদ্ধিবলে আয়ত্ত করিয়া, জগতে প্রতিভার অলৌকিক শক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন। অন্য লোকেরা আশী বছর বয়সের সময়েও তত্ত্বশাস্ত্রের যে সকল কথা পরিগ্রহ করিতে পারে না, শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় জ্ঞান-বৃদ্ধ শিশুরা আট বছর বয়সের সময়েই, সে সকল কথার মর্ম্মভেদ করিয়া, মনুষ্যের বিস্ময় উৎপাদন করেন। যাঁহারা বৈরাগ্যের আত্মা লইয়া অবতীর্ণ হন, তাঁহারা জন্মাবধিই শুকদেব। ব্যাসের বুদ্ধিও তাঁহা-দিগকে বিষয়ে আসক্ত করিতে পারে না,—বিষয়-সুখের কোন রূপ চিত্রই তাঁহাদিগের চিত্তের উপর কার্য্য করিতে

সমর্থ হয় না। যাঁহারা মনুষ্যজগতে ভক্তের আত্মা লইয়া আগমন করেন, তাঁহারাও ঐরূপ আর এক শ্রেণির অসাধারণ লোক। তাঁহাদিগের বুদ্ধি, উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে, অনেক সময় ভ্রম জন্মাইতে পারে,—তাঁহাদিগের ভ্রমান্ধ কল্পনাও, কখনও কখনও এক পথের অন্বেষণে আর এক পথে যাইয়া, তাঁহাদিগকে ক্ষণকালের তরে কষ্টে ফেলিতে পারে। কিন্তু এ সকল সামান্য অভাবসত্ত্বেও ভক্তির অসামান্য বিকাশই তাঁহাদিগকে, সকল সময়ে, আপনার অপার্থিব শক্তিতে উপরের দিকে টানিয়া রাখে। ভক্তি তাদৃশ ক্ষণ-জন্মা পুরুষদিগের হৃদয়ের মধ্যে, জীবনের আরম্ভ হইতেই, একটা জ্বালাশূন্য আগুনের মত, ধীরে ধীরে জ্বলিতে আরম্ভ করে, এবং সে আগুন আগে শরীরের সর্ব্বপ্রকার নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিকে বিনা যন্ত্রণায় শুষিয়া লইয়া, এবং শেষে বুদ্ধি ও কল্পনা প্রভৃতি মনোবৃত্তির উপরেও অশেষ প্রকারে প্রীতিকর প্রভুত্ব করিয়া, আপনি দেবতার স্নিগ্ধজ্যোতিতে ফুটিয়া পড়ে। হরিদাসও নিঃসংশয়ই উল্লিখিতরূপ জন্মসিদ্ধ ভক্ত। নহিলে, তাঁহার জীবন, শিশুসমুচিত সুখ-বিলাসের সময় হইতেই, ভক্তির দিকে গড়াইয়া পড়িত না, এবং তাঁহাকে প্রাতঃস্মরণীয় প্রহ্লাদের মত ভগবানের প্রেমের ভাবে উন্মাদিত রাখিতে পারিত না।

হরিদাস যখন নবীনযুবা, তখন হইতেই তিনি নবীন-

যোগী। মনুষ্যের প্রাণ যে সময়ে ভোগের পিপাসায় লালা-য়িত রহে, তিনি সেই সময় হইতেই, তাঁহার প্রাণের মধ্যে ভক্তির অলৌকিক আকর্ষণে আর এক প্রকার পিপাসায়, পৃথিবীর সহিত সম্বন্ধশূন্য। তিনি গৃহে রহিতে পারিলেন না। গৃহস্থালীর ক্ষুদ্র সুখ ও ক্ষুদ্র সম্পদ তাঁহার বিশাল হৃদয়কে বাঁধিয়া রাখিতে সমর্থ হইল না। তিনি, তাঁহার প্রথম বয়সেই ভক্তির পথে পথিক ও ভগবানের নামে ভিখারী হইয়া গৃহবাস পরিত্যাগ করিলেন, এবং কোথায় যাইয়া কি সাধনা করিলে তাঁহার সেই প্রাণারাধ্য পরমধনকে পাইতে পারিবেন, শুধু এই এক ভাবনায়ই অধীর রহিলেন।

যশোহর জেলার কতকটা স্থান এইক্ষণ বনগ্রাম বলিয়া পরিচিত। পূর্ব্বকালে, বনগ্রামের অনতিদূরে, বুঢ়ননামে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম ছিল। সেই বুঢ়নই হরিদাসের জন্মস্থান। বঙ্গদেশের ইতিহাসে বুঢ়নগ্রামের আর কোন পরিচয় নাই। কিন্তু হরিদাস বুঢ়নগ্রামে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, এই এক কথাই উহার যথেষ্ট পরিচয়।

"বুঢ়ন গ্রামেতে অবতীর্ণ হরিদাস,
যে ভাগ্যে সে সব দেশে কীর্ত্তন প্রকাশ।" (বৃ)

হরিদাসের গুরু কে? কে তাঁহার হরিদাস নাম রাখিল? কে তাঁহাকে সংস্কৃত ভাষায় ও কৃষ্ণকথাময় ভক্তিশাস্ত্রে রীতি-মত শিক্ষা দিয়া কৃতার্থ করিল,—কে তাঁহাকে ভক্তিসাধনের

প্রথম পথ দেখাইয়া দিল? গ্রন্থপত্রে এ সকল বিষয়ের সামান্য উল্লেখও দৃষ্ট হয় না। অথচ,গ্রন্থপত্রে যাহা আছে,তাহাতে দেখা যায় যে, হরিদাস ভগবদ্গীতা ও ভাগবত-পুরাণ প্রভৃতি ভক্তি-শাস্ত্রের সমস্ত গ্রন্থে প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন। তিনি ভক্তিরসের ভাল ভাল শ্লোক সর্ব্বদা আবৃত্তি করিতেন,এবং ছোট বড় সকল-কেই ভক্তির নিগূঢ় মর্ম্ম অতি সহজে বুঝাইয়া দিতে পারিতেন।

বাঙ্গালা ভাষা, হরিদাসের সময়ে, এখনকার মত বিভব-শালিনী ছিল না। বাঙ্গালায় তখন শাস্ত্রের সকল কথা সাধারণ লোককে বুঝান যাইত না, এবং অতি বড় বিজ্ঞ ব্যক্তিরাও, যাবনিক শব্দের সংশ্রব ত্যাগ করিয়া, বাঙ্গালায় মনের সমস্ত ভাব ব্যক্ত করিতে সমর্থ হইতেন না। কিন্তু হরিদাস শাস্ত্রের অতি কঠিন কথা লইয়াও যাহাকে যাহা বুঝাইতেন, তাহা অতি সরল ও শুদ্ধ বাঙ্গালায় পরিব্যক্ত হইত, এবং তাঁহার এমনই একটুকু অসাধারণ ক্ষমতা ছিল যে, সকলেই তাঁহার কথাগুলি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়া হৃদয়ে প্রীতি অনুভব করিত। ইহা সামান্য শিক্ষার কর্ম্ম নহে। হরিদাস কাহার কাছে এই রূপ শিক্ষা পাইলেন?

বৃক্ষ যেমন সূর্য্যের আলোক-সম্পর্কে জীবনী শক্তি লাভ করিয়াও, মূলে জল-সেকের অপেক্ষা করে, এবং জল পাই-লেই বাড়ে; মনুষ্যের হৃদয়, মন ও আত্মাও, স্বভাবের সেইরূপ নিয়মেই শিক্ষা ও সহানুভূতির অপেক্ষা করিয়া

থাকে। কিন্তু ইহা প্রকৃতই নিতান্ত দুঃখের বিষয় যে, হরিদাস হেন ব্যক্তি কাহার নিকট কি শিখিয়াছিলেন, কাহার সঙ্গ পাইয়া, জল-সেক-বর্দ্ধিত ফল-বৃক্ষের ন্যায় বাড়িয়া উঠিয়াছিলেন, কিছুতেই তাহা জানিবার সম্ভাবনা নাই। হরিদাসের সময়ে, হরিনাম-প্রচারক বৈষ্ণবসন্ন্যাসিদিগের মধ্যে, অনেকেই তীর্থদর্শন উপলক্ষে বঙ্গদেশের নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিতেন। তাঁহারা কখনও কখনও অনাথ ও অসহায় বালকদিগকে আশ্রয়দানে চরিতার্থ করিয়া শিষ্যভাবে সঙ্গে লইয়া যাইতেন। হরিদাসের শুভাদৃষ্টেও অবশ্যই ঐ রূপ কোন মহাজনের সঙ্গ ঘটিয়াছিল, এবং অদ্বৈত যেমন মাধবেন্দ্রের দর্শন লাভে, নূতন মানুষ হইয়া, ভক্তিধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, হরিদাসও তাঁহার বাল্যকালে অবশ্যই সেইরূপ কোন মহানুভব বৈষ্ণবসন্ন্যাসীর আকর্ষণে পড়িয়া নবজীবন লাভ করিয়াছিলেন। স্বয়ং মাধবেন্দ্রই যে তাঁহার গুরু নহেন, ইহাই বা কেমন করিয়া নির্দ্দেশ করিব? বঙ্গদেশের তদানীন্তন সমস্ত ভক্তবৈষ্ণবই, সাক্ষাৎ কিংবা গৌণ সম্বন্ধে, মাধবেন্দ্রের শিষ্য। শ্রীহট্ট এবং চট্টগ্রাম প্রভৃতি দূরবর্ত্তি স্থানেও অনেকে মাধবেন্দ্রের মন্ত্রশিষ্য বলিয়া পরিচিত ছিলেন।* এ রূপ অবস্থায় হরিদাসও যে কোন না

---

* চট্টগ্রামনিবাসী পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি ও চৈতন্যবল্লভ দত্ত প্রভৃতি

কোন সূত্রে তাঁহার সহিত সেই ভাবে সম্পৃক্ত নহেন, তাহা কেমন করিয়া বলিব?

বৈষ্ণবকবিরা হরিদাসের শিক্ষা ও দীক্ষা সংক্রান্ত কোন কথার যেমন উল্লেখ করেন নাই, তাঁহার পিতা মাতার পরিচয়প্রসঙ্গেও তাঁহারা সেইরূপ কোন কথাই লিখিয়া যান নাই। তাঁহার পিতা মাতা যবন, ইহা ত পূর্ব্বেই জানিতে পাইয়াছি। কিন্তু তিনি কি সেই যবন পিতা মাতার উৎপীড়নে গৃহত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন? হরিদাসের মত উদার ও অমায়িক ব্যক্তির সম্পর্কে এরূপ কষ্টকল্পনা সুসঙ্গত হয় না। যিনি পথের কাঙ্গালকেও প্রিয় সম্ভাষণে বশীভূত করিতে জানিতেন, এবং কানে অতি রুক্ষ কথা শুনিলেও প্রত্যুত্তরে হাসিমুখে মধুর কথা কহিয়া মানুষের মন ভুলাইতেন, তিনি তাঁহার পিতা মাতার চিত্তে কোনরূপ বেদনা জন্মাইয়াছেন, অথবা পিতা মাতার বিরাগ ও বিদ্বেষে বাড়ি ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়াছেন, ইহা সম্ভবপর নহে। হরিদাসের মত ভগবৎপরায়ণ ভক্ত পুরুষেরা, জীবনের উচ্চলক্ষ্য সাধনের জন্য, পিতা মাতার পদাশ্রয় ত্যাগ করিয়া দূরে যাইতে পারে; কিন্তু তাঁহাদিগকে কখনও ঘুণাক্ষরেও ক্লেশ দিতে পারে না,—তাঁহাদিগের প্রতি অকৃতজ্ঞ হয় না।

অদ্বৈতের সমানবয়স্ক ব্যক্তিরা সকলেই মাধবেন্দ্রের কাছে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন।

প্রকৃত কথা এই, হরিদাস যখন বঙ্গীয় ভক্তসমাজে প্রথম পরিচিত, তখন তিনি তপঃপরায়ণ ঋষি,—তেজঃপুঞ্জ পবিত্র পুরুষ। বৈষ্ণবমাত্রই তখন তাঁহার সম্বন্ধে ভক্তিতে জড়ীভূত,—ভাবে বিভোর। বৃন্দাবনদাস তাঁহার হৃদয়ের ভাব ভাষায় প্রকাশ করিতে যাইয়া কহিয়াছেন,——

"হরিদাস স্পর্শ বাঞ্ছা করে দেবগণ,
গঙ্গাও বাঞ্ছেন হরিদাসের মার্জ্জন।
স্পর্শের কি দায় দেখিলেই হরিদাস,
ছিণ্ডে সর্ব্ব জীবের অনাদি কর্ম্মপাশ।
হরিদাস আশ্রয় করিবে যেই জন,
তারে দেখিলেও খণ্ডে সংসার-বন্ধন।
শত বর্ষে শত মুখে উহান মহিমা,
কহিলেও নাহি পারি করিবারে সীমা।
ভাগ্যবন্ত তোমরা যে তোমা সবা হৈতে,
উহার মহিমা কিছু আইল মুখেতে।
সকৃৎ যে বলিবেক হরিদাস নাম,
সত্য সত্য সেই যাইবেক্ কৃষ্ণধাম।"

কবিরাজগোস্বামী লিখিয়াছেন,——

"সব কহা না যায় হরিদাসের অনন্ত চরিত্র,
কেহ কিছু কহে আপনাকে করিতে পবিত্র।"

মানুষ মানুষের স্তুতিকীর্ত্তন করিতে যাইয়া আর কি কহিতে পারে? ইহাতে নিশ্চয়ই এই প্রতীতি হয় যে, তীর্থ-

যাত্রী যেমন ভাগীরথীর উচ্ছলিত প্রবাহ দেখিয়াই প্রণত রহে; সে প্রবাহ কোন্ দেশ হইতে, কোন্ পবিত্র অথবা অপবিত্র পথ দিয়া বহিয়া আসিয়াছে, তাহার অনুসন্ধান করিতে ভালবাসে না, অথবা কথাটারে কানে শুনিলেও মুখে আনিতে ইচ্ছা করে না, বৈষ্ণবকবিরাও হরিদাসের তীর্থীভূত পূত চরিত্র এবং ভাগীরথীপ্রতিম ভক্তিপ্রবাহ দেখি-য়াই মোহিত রহিয়াছিলেন; সে চরিত্র এবং সে ভক্তি কি রূপে বিকসিত হইয়াছিল, তাহার অনুসন্ধান করিতে ইচ্ছা করেন নাই। তাঁহারা প্রায় সমসাময়িক লোক হইয়াও হরিদাসের পিতা মাতার পরিচয় ও প্রথমবাল্যসংক্রান্ত যে সকল কথার আলোচনায় বিরত রহিয়াছেন, আজি পাঁচ শত বৎসর পরে সে সকল কথা লইয়া অনুসন্ধান ও আলো-চনা করিবার জন্য ঐতিহাসিক ভিত্তিলাভের সম্ভাবনা কোথায়?

দশম পরিচ্ছেদ।

প্রথম বিকাশ।

বঙ্গে হরিদাস ঠাকুরের প্রথম পরিচয় অথবা প্রথম প্রকাশ বেণাপোল নামক বন-ভূমির মধ্যে বনের তৃণলতাদ্বারা বিরচিত বিজন কুটীরে। এই বেণাপোলও এখনকার বনগ্রাম মহকুমারই অন্তর্গত একটি অপরিচিত স্থান। হরিদাসের প্রথম বয়সে, তদীয় জন্মস্থান বুঢ়নগ্রামে, মাঝে মাঝে তাঁহার যাতায়াত থাকা সম্ভব। কিন্তু তিনি যখন অকৃতদার অবস্থায়, গৃহবাসের সকল আশা পরিত্যাগ করিয়া, গার্হস্থ্য-সুখের নিকট জন্মের মত বিদায় লইলেন, তখন ঐ বেণাপোলের দুর্গম বনই, কিছু কালের তরে, তাঁহার বাসস্থান হইল।

"হরিদাস যবে নিজ গৃহ ত্যাগ কৈলা,
বেণাপোলের বন মধ্যে কতো দিন রহিলা।" (কৃ)

বেণাপোলের বন-ভূমির মধ্যে অকস্মাৎ একটি দীপ জ্বলিল,—বন-ভূমির গভীর অন্ধকার, কিছু দিনের মধ্যেই, বিদ্যুদ্দাম-বিভাসিত নিবিড়-নীল মেঘের ন্যায়, পথিকের চক্ষে প্রতিভাত হইল। সে বন, হরিদাসের ভক্তির প্রভাবে, প্রকৃতই উজ্জ্বল মূর্ত্তি ধারণ করিল, এবং বনের অদূরবর্ত্তী গৃহস্থেরা নানা শ্রেণির লোকের নিকট হরিদাসের কিছু কিছু পরিচয় পাইয়া, ক্রমে তাঁহার সন্নিহিত হইতে লাগিল।

এই পৃথিবীর যেখানে মাটীতে একটুকু মিষ্টবস্তু পড়িয়া রহে, সেখানেই ক্রমে পিপীলিকার একটি হাট হইয়া থাকে। মানুষের চিত্তবৃত্তি মিষ্টবস্তুর অন্বেষণে পিপীলিকার উপমা-যোগ্য। হরিদাস আপনাকে দীনের দীন জ্ঞানে, দীনবন্ধুর পদারবিন্দধ্যানে, বন-ভূমির বিজন-নিবাসে লুকাইয়া রহিলেন। কিন্তু তাঁহার হৃদয় ও রসনায় একটুকু মিষ্টবস্তু ছিল। যেই লোকে তাহা জানিতে পারিল, অমনই তাঁহার কুটীরের চারি পার্শ্বে পিপীলিকার হাটের মত মানুষের হাট বসিল।

এইরূপ মানুষের হাট ভক্তের দুয়ারে তখনও পরিলক্ষিত হইত, এবং এখনও গ্রামে, নগরে,—গ্রামের বাহিরে,—নগরের উপকণ্ঠে,—অথবা পাহাড়ে ও প্রান্তরে প্রতিদিন পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। ইহাতে ভক্তের কোন মহিমা নাই; মহিমা এক দিকে মনুষ্যের প্রকৃতিনিহিত ভক্তির, আর এক দিকে ভক্তির পরমারাধ্য ও চরমভোগ্য ভগবান্ জগদীশ্বরের। কারণ, জীবের সহিত জগদীশ্বরের সম্বন্ধ বড় গাঢ়,—বড় ঘনিষ্ঠ। মাতৃস্তন্যের সহিত শিশুর,—মৃত্তিকার সহিত তৃণ-লতার, অথবা জলের সহিত মৎস্যাদি জল-জন্তুমাত্রের যে সম্বন্ধ, জীবের সহিত জগজ্জীবন ও জগন্নিবাস জগদীশ্বরের তাহা অপেক্ষাও অনন্তগুণে ও অনন্তপ্রকারে অধিকতর নিকটসম্বন্ধ। সে সম্বন্ধ এত বেশী দৃঢ়বদ্ধ,—এমন অনির্ব্বচনীয়, এমনই সুখ-সুন্দর ও মধুর যে, মনুষ্যের আত্মা তাহার

মর্ম্ম বুঝিবার নিমিত্ত যত্নবান্ হইয়া অসংখ্য শাস্ত্র * উদ্ভাবন করিয়াছে, কিন্তু কোন শাস্ত্রেই প্রকৃত তত্ত্বের শেষ সীমায় পঁহুছিতে পারে নাই ; এবং যাহা বা আত্মায় অনুভূত হইয়াছে, মনুষ্যের ভাষা তাহাও অদ্যপর্য্যন্ত সম্যক্ পরিব্যক্ত করিতে সমর্থ হয় নাই।

যুগান্তর হইল, পুরাতন ঋষিরা, জীব ও জগদীশ্বরের নিকট-সম্বন্ধ-জনিত মহাতত্ত্ব আত্মায় কতকটা অনুভব করি-

---

* শঙ্করাচার্য্য কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত বেদান্তশাস্ত্রের অদ্বৈতবাদ,—ন্যায়-শাস্ত্রের দ্বৈতবাদ,—রামানুজের দ্বৈতাদ্বৈতবাদ এবং হর্বট্ স্পেন্সার-প্রমুখ অধুনাতন ইয়োরোপীয় বৈজ্ঞানিকদিগের বিবর্ত্তবাদ অথবা পরিণাম-বাদ (Theory of Evolusion) প্রভৃতি দুর্ব্বোধ-শাস্ত্রসমূহে শুধু এই এক কথারই আলোচনা। যেমন সমুদ্রের সহিত সমুদ্রতরঙ্গ সর্ব্বতোভাবে অভিন্ন, জগদীশ্বরের সম্বন্ধেও জীবমাত্রই অদ্বৈতবাদের মতানুসারে সেইরূপ অভিন্ন ; তাঁহাতেই তরঙ্গের মত ফুটিতেছে,—তরঙ্গের মত লীলা করিতেছে, এবং পরিশেষে তরঙ্গের ন্যায় বিলয় পাইতেছে। দ্বৈতবাদে জীব আর ব্রহ্ম পরস্পর বিভিন্ন। এই জন্যই জীব দাস এবং জগদীশ্বর দাসের উপাস্য। দ্বৈতাদ্বৈতবাদ এই দুইয়ের মধ্যবর্ত্তী। এই শাস্ত্রের ব্যবস্থানুসারে জীব জগদীশ্বর হইতে ভিন্ন হইয়াও অভিন্ন। বিবর্ত্তবাদ এই জগতের সমস্ত পদার্থকেই জগদাদিভূত মহাশক্তির ক্রমবিকাশ বলিয়া বর্ণনা করে। সুতরাং দৃষ্ট হইবে যে, উপরিলিখিত সমস্ত মত অনুসারেই জীব জগদীশ্বরের সহিত নিতান্ত দুশ্ছেদ্য সম্বন্ধে চির-জড়িত।

য়াছিলেন, এবং এই হেতুই তাঁহারা তাঁহাদিগের সেই আরাধনার ধনকে কখনও প্রাণের প্রাণ—চক্ষুর চক্ষু—শ্রোত্রের শ্রোত্র ও মনের মন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন; কখনও বা তাঁহাকে পুত্র হইতে প্রিয়তর, বিত্ত হইতে অধিকতর প্রীতিকর এবং সংসারের অন্য সর্ব্বপ্রকার পদার্থ হইতেই অধিকতর আনন্দপ্রদ ও আত্মার অন্তরতম বস্তু * বলিয়া বুঝাইতে চাহিয়াছেন। যাহাদিগের অন্তরে সামান্য একটুকু ভক্তির স্ফুরণ আছে, তাহারা এখনও এই মহাসত্য সময়ে সময়ে কিঞ্চিৎ পরিমাণে হৃদয়ে উপলব্ধি করিয়া কেমন এক প্রকার অতৃপ্তির ভাবে অধীর হয়, এবং এই পৃথিবীর কোথায় যাইয়া হৃদয়ের জ্বালা জুড়াইবে—হৃদয়ের অব্যক্ত আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবে, তাহা চিন্তা করিয়া অবসন্ন রহে।

মনুষ্য তাহার প্রাণ, মন এবং হৃদয় ও আত্মার সূত্রে সূত্রে ও গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে জগদীশ্বরের সহিত জড়িত রহিয়াও যে, সাংসারিক সুখের ক্ষণিক মোহে তাঁহাকে ভুলিয়া রহে, ইহাও কৃপাসিন্ধু জগদীশ্বরেরই কৃপার নিদর্শন। কারণ, সদ্যোজাত শিশুর অশক্ত, অপটু ও অতি কোমল চক্ষু সহসা যদি সূর্য্যরশ্মির সন্নিহিত হয়, তাহা হইলে উহা সেই মুহূর্ত্তেই

* "শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসোমনো যদ্ বাচোহবাচম্। সউ প্রাণস্য প্রাণশ্চক্ষুষশ্চক্ষুঃ।—তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়োবিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ অন্তরতরং যদয়মাত্মা।" ইত্যাদি।

বিপন্ন হইয়া পড়ে; এবং মনুষ্যের আত্মাও যদি, জীবনের স্তরে স্তরে, কর্ম্মজন্য শিক্ষার সাহায্যে, উপযুক্ত শক্তি লাভ না করিয়া, সহসা সেই জগৎসূর্য্য জগদীশ্বরের অনন্ততেজোময় অনন্তপ্রভাবের সন্নিহিত হয়, তাহা হইলে তাহার উন্নতির পথে ঘোরতর বিঘ্ন ঘটে। নহিলে, মনুষ্য জগদীশ্বরের দর্শন লাভে বঞ্চিত রহিবে কেন? মনুষ্যের প্রাণটা যেখানে রহিয়াছে, সেই প্রাণের প্রাণ পূর্ণস্বরূপও ঠিক্ সেইখানেই পিতা মাতা, পরিত্রাতা এবং সর্ব্বসম্পদ্-বিধাতা সুহৃদের ন্যায়, সর্ব্বক্ষণ সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছেন। মনুষ্য তাহার এমন জনকে একবারেই উপলব্ধি করিতে পারে না কেন?

কিন্তু, যদিও চক্ষু তাঁহাকে দেখিতে পায় না, কর্ণ তাঁহার কথা শুনিতে অধিকারী হয় না, তথাপি মনুষ্য তাঁহারই জন্য অজ্ঞাতসারে আকুল রহে, এবং যেখানে তাঁহার কোনরূপ আবির্ভাবের লক্ষণ দেখে,—তাঁহার কোনরূপ পরিচয় পাওয়ার আশা পায়, অথবা তাঁহার বিশেষ কোন কৃপার চিহ্ন থাকা অনুমান করে, মনুষ্য সেখানেই মধুলুব্ধ পিপীলিকার মত ঝুঁকিয়া পড়ে। এই জন্যই তীর্থে তীর্থে লোকারণ্য,—যেখানে অলৌকিকতার অণুমাত্র গন্ধ, সেখানেই লোকের ভিড়, এবং এই জন্যই ভক্তের দুয়ারে চিরকাল মানুষের হাট। ভক্তের কথা দূরে থাকুক, যাহারা আকারে প্রকারে, আহারে ও আচারে, অথবা পরিচ্ছদাদির বিচিত্রতায় ভক্তির কোন না

কোনরূপ কৃত্রিম ভেক ধারণ করিয়া, পদ প্রতিপত্তি, প্রভুত্ব ও অর্থ, অথবা অন্যবিধ পার্থিব সুখ-সম্পদের জন্য ঘুরিয়া বেড়ায়, মনুষ্য সে সকল ভক্তিব্যবসায়ীরও সঙ্গ ছাড়ে না। সুতরাং ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ভক্তের দুয়ারে সর্ব্বত্রই যে মানুষের হাট যোটে, ইহাতে ভক্তের কোন মহিমা নাই; মহিমা এক দিকে ভক্তির, আর এক দিকে ভগবানের। হরিদাসের সে কুটীরের দুয়ারেও, অল্প সময়ের মধ্যেই, হাট মিলিল। কিন্তু যাহারা সেখানে যাতায়াত করিতে লাগিল, তাহারা জগদীশ্বরের কৃপায় ধীরে ধীরে প্রাণে শীতল হইল। কেন না, হরিদাস প্রকৃত ভক্ত। তাঁহার ভেক ছিল না; ছিল শুধুই ভক্তি।

হরিদাস তাঁহার কুটীরের নিকট একটি তুলসী তরু রোপণ করিয়াছিলেন। তিনি সূর্য্যোদয়ের একটুকু পূর্ব্বেই শয্যা ত্যাগ করিয়া প্রাতঃস্নান করিতেন, এবং তার পর তুলসীর মূলে জল-সেচন করিয়া তাঁহার সেই তৃণকুটীরে নাম জপে নিবিষ্ট হইতেন। তাঁহার এই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, মনুষ্য যেমন কেন পাপিষ্ঠ হউক না, সে যদি অন্যমনে কিংবা নিতান্ত অনিচ্ছায়ও তাহার জিহ্বায় অমৃতময় হরিনাম উচ্চারণ করে, তাহার পাপ তাপ তাহা হইলে ভস্মীভূত হয়। হরিদাসের এই সজীব বিশ্বাস স্বর্গ-সম্পদ হইতেও অধিকতর মূল্যবান্। এ সংসারে কয় জনে এমন বিশ্বাস হৃদয়ে পোষণ করিতে পারে?

লোকে নাম জপ করে নীরবে, হরিদাস জপ করিতেন পরিশ্রুত স্বরে। তিনি কুটীরে বসিয়া এমন সুমধুর ধ্বনিতে হরিনাম উচ্চারণ করিতেন যে, লোকের প্রাণে তাহা সঙ্গীতের ন্যায় সুখ-জনক হইত, এবং সেই এক প্রকার নাম-সংকীর্ত্তন শুনিবার জন্য, দিবসের প্রায় সকল সময়েই বহু লোক তাঁহার আশ্রমের অদূরে বসিয়া থাকিত। হরিদাসের এই রূপ সংস্কার ছিল যে, যাহারা দৈবাৎও কদাপি পরের মুখে হরিনাম শুনিতে পায়, তাহারাও পাপের শৃঙ্খল হইতে মুক্তি লাভ করিয়া ভব-সাগরে তরিয়া যায়। তিনি যে পরিশ্রুতস্বরে জপ করিতেন, ইহাই তাহার মুখ্য কারণ।

ঠাকুর হরিদাস সমস্ত দিন নাম-জপের এই রূপ নির্ম্মল আনন্দে অতিবাহিত করিতেন, এবং সন্ধ্যার খানিক আগে, বনের ভিতর হইতে বাহির হইয়া, নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহের মধ্যে কোন ব্রাহ্মণের বাড়ী মুষ্টিমিত অন্ন ভিক্ষা স্বরূপ চাহিয়া লইতেন। যথা, চরিতামৃতে,——

"নির্জন বনে কুটীর করি তুলসী সেবন,
রাত্রি দিনে তিন লক্ষ নাম-সংকীর্ত্তন।
ব্রাহ্মণের ঘরে করে ভিক্ষা নির্ব্বাহন,
প্রভাবে সকল লোক করয়ে পূজন।"

হরিদাসের নিয়ম ছিল প্রতিমাসে এক কোটি জপ। সুতরাং প্রতিদিন অন্ততঃ তিন লক্ষ নাম জপ না হইলে

তাঁহার সংখ্যা পূর্ণ হইত না। ইহা দিবামানের দ্বাদশ ঘটি-কায় অসম্ভব। হরিদাস এই নিমিত্ত সন্ধ্যার পর আবার আসনে বসিয়া নাম-জপ অথবা উল্লিখিতরূপ নামকীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিতেন, এবং যত ক্ষণ না তাঁহার সেই সঙ্ক-ল্পিত তিন লক্ষ সংখ্যা সম্পূর্ণ হইত, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ধ্যান-স্তিমিত মহাযোগীর ন্যায় উপবিষ্ট রহিতেন।

এই রূপ নাম-জপ গীতা ও ভাগবতে জপ-যজ্ঞ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। মনুসংহিতা গীতার বহু পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থ। মনস্বিকুলের অগ্রগণ্য তত্ত্বদর্শী মনুও ভগবানের নামজপকে জপ-যজ্ঞ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এবং ইহাকে তৎকাল-প্রচলিত অশ্বমেধ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার যজ্ঞ হইতে সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। ঈদৃশ জপের প্রকৃত অর্থ কি? ইহাতে কি জীবনের কোন রূপ সার্থকতা ঘটে, অথবা ইহা কি সাধনার পথে কোন অংশেও জীবের সহায় হইয়া থাকে?

প্রশ্ন সহজ, উত্তর একটুকু কঠিন। যাঁহারা প্রেমভক্তির অনন্ত পিপাসায় উন্মাদিত হইয়া ভগবানের অনন্ত স্বরূপে ডুবিয়া রহিয়াছেন, এ সকল কথার নিগূঢ় তত্ত্ব তাঁহারা ভিন্ন অন্যে ভালরূপ বুঝিতে পারে না। তথাপি সামান্য বুদ্ধিতে সাধারণতঃ যাহা বুঝি, তাহাই এখানে সংক্ষেপে বুঝাইতে যত্নবান্ হইব।

ভগবান্ জগদীশ্বর সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বদর্শী, সর্ব্বান্তর্য্যামী, এবং সর্ব্বমঙ্গলালয়। এ সংসারে এমন স্থান কোথায় আছে, যেখানে তিনি নাই? এমন ঘটনা কি হইতে পারে, যাহা তাঁহার চক্ষে পড়ে না? এমন জন কে আছে, যাহার প্রাণের কথা তিনি পরিজ্ঞাত নহেন? আর, এমন অধমই বা কে আছে, যে তাঁহার কাছে আশ্রয় পাইবে না? তবে আবার জগদীশ্বরের কাছে জীব সাংসারিক জীবনের সুখ-সম্পদ্ অথবা মুক্তির জন্য পৃথিবীর সকল দেশেই যুক্ত করে প্রার্থনা করিয়া আসিতেছে কেন? তুমি প্রার্থনা করিবার অনন্তকাল পূর্ব্ব হইতেই যখন তিনি প্রার্থিত বিষয়ের সকল কথা জ্ঞাত হইয়া রহিয়াছেন, তখন তুমি তাঁহার কাছে আবার নূতন একটা প্রার্থনা করিবে কি? বিজ্ঞান এখানে নিরুত্তর। কিন্তু ভক্তি, বিজ্ঞানের অনধিগম্য ঊর্দ্ধজগতে আলোকের ন্যায় প্রতিভাত হইয়া, মনুষ্যকে ভগবানের নিকট সতত প্রার্থনা করিবার জন্য আকর্ষণ করিতেছে; এবং যাঁহারা বিজ্ঞানকে ভক্তির আলোকে পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাও ইহা বুঝাইয়াছেন যে, ঐ প্রার্থনাতেই, রুদ্ধগৃহের দ্বারমোচনের ন্যায়, জীবাত্মার পাপ-মোচন। তুমি যদি ঘরের সমস্ত দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখ, তাহা হইলে সূর্য্যের রশ্মি কিরূপে সেখানে প্রবেশ করিবে? অথবা তুমি যদি তোমার প্রাণটাকে ক্ষণ-কালের তরেও প্রাণ-জীবন জগদীশ্বরের দিকে উন্মুখ হইতে

না দেও, তাহা হইলে কি রূপে সেখানে তাঁহার করুণার জ্যোতি নিপতিত হইবে? ইহাই প্রেমময়ের অনন্তবিস্তারিত প্রেমের বিধি, এবং সুতরাং ইহাতেই প্রার্থনার প্রত্যক্ষ সাফল্য। কিন্তু, প্রার্থনাও যে কথা, জপও প্রকারান্তরে সেই কথা। জীব প্রার্থনাদ্বারা কামনা জানায়, জপের দ্বারা জগদীশ্বরকে সতত স্মরণ করে। জপের যদি এতটুকু সার্থকতা না থাকিত, তাহা হইলে জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধক ও ভক্তেরা কখনও উহাতে সমাহিত রহিতে পারিতেন না। হরিদাসের পক্ষে জপ ও জীবন এক হইয়া গিয়াছিল। তিনি যখন উল্লিখিত রূপ জপ-যজ্ঞে নিমগ্ন হইতেন, তখন তাঁহার নয়নে ধারা বহিত; শরীর মুহুর্মুহুঃ কেমন এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দে রোমাঞ্চিত হইত, মুখশ্রীতে দেবতার মাধুর্য্য ফলিত, এবং তিনি যবনের ঘরে না কোথায় জন্মিয়াছেন, তাহা বিস্মৃত হইয়া লোকে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দেবতা জ্ঞানে পূজা করিত। হরিদাস যে অদ্যাপি বঙ্গের সাহিত্যে ও সমাজে বহু লোকের হৃদয়ে ভক্তির আসন যুড়িয়া বসিয়া আছেন, এ বিষয়ে এইক্ষণ আর কাহার বিস্ময় জ্ঞান হইতে পারে?

ঠাকুর হরিদাসের এ প্রভাব, যেন মনুষ্যপ্রকৃতির আর একটা ভাব মনুষ্যকে ভাল করিয়া বুঝাইবার জন্য, অল্প-কালের মধ্যেই আশে পাশে অনেকের অসহ্য হইয়া উঠিল; এবং যেমন এক দিকে অনেক লোক তাঁহাকে হৃদয়ের সহিত

ভক্তি করিতেছিল, আর এক দিকে তেমনই অনেক লোক তাঁহার মত নির্লিপ্ত, নিরুপদ্রব ও নিঃস্পৃহ ভক্তকেও হৃদয়ের সহিত ঘৃণা ও বিদ্বেষ করিতে লাগিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যাঁহারা এই পৃথিবীতে সাধারণের অনধিগম্য, এই রূপ বিড়ম্বনাই, সকল দেশে ও সকল কালে, তাঁহাদিগের উচ্চতর জীবনের ব্রতদক্ষিণা। মনুষ্য-সমাজের এক হস্ত তাঁহাদিগের মস্তকে প্রীতির পুষ্পবৃষ্টি করে, আর এক হস্ত তাঁহাদিগের বক্ষঃস্থলে ক্রূরতার কুঠার লইয়া আঘাত করিতে থাকে,—এক ভাগ তাঁহাদিগকে ভালবাসার অমৃত আনিয়া উপহার দেয়, আর এক ভাগ তাঁহাদিগের মুখে ঈর্ষ্যার বিষ তুলিয়া দিবার জন্য, সক্রেতিশের সমসাময়িক গ্রীকদিগের ন্যায়, উন্মত্ত হয়। ফলতঃ, উন্নতমনা ও ঊর্দ্ধচর মহাত্মাদিগের ভাগ্যে সাধারণতঃ যাহা ঘটিয়া থাকে, হরিদাসের ভাগ্যেও অচিরেই তাহা ঘটিল, এবং বনগ্রাম প্রদেশের বিজ্ঞ যোগ্য লোকদিগের মধ্যে অনেকেই তাঁহাকে বিপন্ন করিবার জন্য বিবিধ উপায় অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

পরীক্ষার আরম্ভ।

বনগ্রাম প্রদেশের তদানীন্তন ভূম্যধিকারী রাজা রামচন্দ্র খান। বনগ্রাম হইতে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের তটে ছত্র-ভোগ নামক সুপরিচিত গ্রাম পর্য্যন্ত সমস্ত স্থানই তখন রাম-চন্দ্রের অধিকারভুক্ত। তখনকার বঙ্গীয় হিন্দুরা বঙ্গেশ্বর যবন-ভূপতির নিকট খান, মজুমদার, মহলানবিশ, মৌস্তফী, মীরবহর, এবং দস্তিদার ও শীকদার প্রভৃতি উপাধি লাভ করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিতেন; যাঁহারা ধন-বলে কিংবা জন-বলে একটুকু বড়, তাঁহারা খান কিংবা মজুমদার শ্রেণির লোক হইয়াও নিজ নিজ অধিকারের মধ্যে রাজা বলিয়া পরিচিত রহিতেন। রামচন্দ্র খানও বনগ্রাম প্রদেশে ঐরূপ রাজা ছিলেন। তিনি যবন রাজাকে নামমাত্র রাজকর দিতেন; কিন্তু আপনার বিশাল অধিকারের মধ্যে আপনিই সকলের উপর বাহুবলে রাজত্ব করিতেন।

রামচন্দ্র জাতিতে কায়স্থ, এবং যে সময়ের কথা হই-তেছে, তখন বলিষ্ঠ যুবা, বহুসংখ্য স্তাবকে পরিবৃত, ভক্ত-দ্বেষী এবং ভোগ-বিলাসে বিভোর। চরিতামৃত-রচয়িতা কবিরাজ গোস্বামী প্রায়শঃ কাহাকেও গালি দেন নাই। তিনি এ অংশে অন্যান্য সাম্প্রদায়িক কবিদিগের অনেক উপরে। কিন্তু তাদৃশ ধীর-স্বভাব ও ধর্ম্মপরায়ণ লেখকও

যখন রামচন্দ্রকে পাষণ্ডের প্রধান বলিয়া গালি দিয়াছেন, তখন ইহাই নিশ্চয় যে, রামচন্দ্র খান তাঁহার প্রথম বয়সে নিতান্তই পরদ্রোহী ও পাপাশয় লোক ছিলেন। যথা, চরিতামৃতে,—

"সেই দেশাধ্যক্ষ নাম রামচন্দ্র খান,
বৈষ্ণব-দ্বেষী সেই পাষণ্ড প্রধান।"

যতদূর জানা যায়, তাহাতে বোধ হয় যে, রামচন্দ্র খাঁর এক বাড়ি ছিল বনগ্রামে, আর এক বাড়ি ছিল সমুদ্রের তটে পূর্ব্বোল্লিখিত ছত্রভোগ নামক স্থানে। তিনি কখনও বনগ্রামের বাড়িতে অবস্থিত রহিয়া তাঁহার এই বিস্তৃত অধিকারের উত্তরভাগ পর্য্যবেক্ষণ করিতেন; কখনও বা ছত্রভোগে যাইয়া সে দিকের কার্য্য দেখিতেন। কিন্তু তিনি যখন যেখানে থাকিতেন, সেখানেই কতকগুলি পাইক, পিয়াদা ও লাঠিয়ালের দ্বারা আপনাকে পরিবেষ্টিত রাখিতেন।

পাইকই তখনকার রাজা ও জমিদারদিগের প্রাণের সুহৃদ্। পাইকেরা তাঁহাদিগের কাছে বসিতে পাইত,—আমোদ প্রমোদের সকল কথারই ভাগী হইত, এবং সর্ব্বদাই প্রিয় সহচরের ন্যায় সঙ্গে চলিত। জমিদারেরা যখন গ্রামে বাহির হইতেন, তখন আগে যাইত একটা কাড়াওয়ালা, তাহার কাড়া বাজাইয়া; এবং পাশে ও পাছে চলিত কতক গুলি পাইক; তাহাদের লাঠি ঘুরাইয়া। পাইকের সহিত এত

প্রণয় না থাকিলে প্রতিদিনের আপদ বিপদে প্রাণ রক্ষা করে কে? কোন কোন জমিদার লাঠিয়ালি বিদ্যায় বিশেষ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া বহু পাইকের উপর আপনিই প্রধান-পাইক বলিয়া সম্মানিত হইতেন। রামচন্দ্র খাঁ সেইরূপ পাইকের সরদার ছিলেন কি না, তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু তিনি এত পাইকের উপর প্রভুত্ব করিতেন যে, লোকে তাঁহার নাম শুনিলেই ভীত হইত।

যখন বনগ্রামের ছোট বড় সকলেই হরিদাসের নির্ম্মল জীবনসংক্রান্ত নানা কথা লইয়া নানারূপ সমালোচনায় ব্যাপৃত, তখন রামচন্দ্রখাঁও সম্ভবতঃ তদীয় পাইকদিগের প্রমুখাৎ ক্রমে তাঁহার সবিশেষ পরিচয় পাইলেন; অপিচ, একটা নীচ-জাতীয় ভিক্ষুক-বৈষ্ণব, ভক্তির ভাণ মাত্র অবলম্বন করিয়া, এত লোককে ভজাইতেছে,—এমন বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছে, এবং বন-ভূমির অন্ধকারে থাকিয়াও গ্রামে ও নগরে এত লোকের চিত্তের উপর ঠাকুরালির চতুরতা করিয়া যাইতেছে, ইহা তিনি একটুকু আশ্চর্য্য মনে করিলেন। শুধু ইহাই নহে, তিনি হরিদাসের উপর যতদূর সম্ভব বিরক্ত ও বিদ্বিষ্ট হইলেন। যাহারা, হরিদাসকে মনে নিতান্ত বিদ্বেষ করিয়াও, মুখে কোন কথা কহিতে সাহস পাইত না, তিনি তাহাদিগকে সাহস ও উৎসাহ দিতে লাগিলেন।

"হরিদাসে লোকে পূজে সহিতে না পারে,
তাঁর অপমান করিতে নানা উপায় করে।" (কৃ)

কিন্তু রামচন্দ্র খাঁর কোন উপায়েই আপাততঃ কিছু হইল না। ঝড় বহিল, কিন্তু বৃক্ষ টলিল না। কাকের কর্কশ কোলাহল কানে পশিয়াই নিবৃত্ত হইল, প্রাণে পশিবার সুযোগ পাইল না। হরিদাস আগেও যেমন ছিলেন, এখনও তেমনই রহিলেন। তিনি সেই বনের মধ্যে ছায়াশীতল বনপাদপের প্রশান্ত সৌন্দর্য্যে অবিচলিত রহিয়া, শত্রু মিত্র সকলকেই ভগবৎকৃপার পরিপূর্ণ আনন্দে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। হরিদাসের বহুগুণের মধ্যে, জীবনের এই প্রথম পরীক্ষার সময়ে দুই তিনটি গুণ বিশেষ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি কিছুতেই ক্রুদ্ধ হইতেন না,—কিছুতেই আপনার সরস-মধুর প্রফুল্লতা ও বিনয়নম্র দীন-ভাব হইতে স্খলিত হইয়া একটা রুক্ষ আকৃতি ধারণ করিতেন না ; এবং যাহারা ব্যঙ্গ বিদ্রূপ ও বিদ্বেষের ভাষায় তাঁহার মর্ম্ম দাহন করিতে চাহিত, তিনি তাহাদিগকেও মন্দ ভাবিতেন না।

পৃথিবীর অধিকাংশ ভক্ত ধার্ম্মিকই, মনুষ্যজাতির দুর্ভাগ্যবশতঃ, অমাবস্যার প্রত্যক্ষ বিগ্রহ। তাঁহাদিগের মুখচ্ছবি মলিন, দৃষ্টি মাধুর্য্যশূন্য ও অভিমানের কঠোরতায় সঙ্কুচিত, মূর্ত্তি যার পর নাই তিক্ত, এবং ভাষা নৈরাশ্যনির্দয়তা ও বিষাদ-বিষের নির্ম্মুক্ত প্রবাহ। তাঁহারা প্রাণ খুলিয়া হাসিতে

পারেন না। পাছে ঐ রূপ হাসিলে, ধর্ম্মাভিমানের ঘনীভূত ভাব তন্মুহূর্ত্তেই কর্পূরের ন্যায় উড়িয়া যায়, এই ভয়েই তাঁহারা জড়সড় রহেন। তাঁহারা প্রাণ ভরিয়া কাহাকেও ভালবাসিতে পারেন না,—মানুষের কথা দূরে থাকুক, বাগানের ফুল অথবা বনের পাখীটিরেও তাঁহারা ভালবাসার উদ্বেল উচ্ছ্বাসে আদর করিতে সাহস পান না। পাছে ঐ রূপ ভালবাসায় তাঁহাদিগের ভক্তজনোচিত গাম্ভীর্য্য ও ভজন-সাধনের সকল আশা নষ্ট হইয়া যায়, এই চিন্তায়ই তাঁহারা অহোরাত্র কুণ্ঠিত থাকেন। তাঁহাদিগকে দেখিলেই মনুষ্যের মনে আপনা হইতে এই রূপ সংস্কার জন্মে যে, ভক্তি অথবা ভক্তের আরাধ্য ধর্ম্ম বুঝি বড়ই একটা বিরস, বিস্বাদু ও বিকট পদার্থ। তাহা না হইলে মনুষ্য ভক্তির পথ গ্রহণ-মাত্রই এই রূপ রুগ্ন, জীর্ণ ও বিষাদ-মগ্ন হইয়া আকাশের চন্দ্রলেখা অবধি কুলু-কুলু-নাদিনী তরঙ্গিণীর তট-তরু শোভি শ্যাম-রেখা পর্য্যন্ত সংসারের সমস্ত বস্তুকেই বিষাক্ত চক্ষে নিরীক্ষণ করিবে কেন?

কিন্তু ভক্তির ধর্ম্ম হরিদাসের হৃদয়ে আর এক রূপ প্রতি-ভাত হইয়াছিল। তিনি সকল অবস্থাতেই প্রফুল্ল, সকলের প্রতিই প্রসন্ন, এবং যাহাকে সাধারণ লোকে অধমের অধম বলিয়া ঘৃণা করিত, তাহার কাছেও প্রণত রহিতে ভাল-বাসিতেন। তিনি কখনও এই রূপ মনে করিতেন যে,

ভগবানের প্রতি জীবের যেরূপ ভক্তি হওয়া বাঞ্ছনীয়, তাঁহার হৃদয়ে সেই রূপ ভক্তি জন্মে নাই,—তিনি প্রাণ ভরিয়া ভগবান্‌কে ডাকিতে পারেন নাই, তাই মাঝে মাঝে লোকে তাঁহার প্রতি বিদ্বেষ ও বিরক্তি প্রদর্শন করিয়া তাঁহাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতেছে;—কখনও ভাবিতেন যে, মনুষ্য যেমন জ্বর-বিকারে প্রলাপ বলে, তাঁহার বিদ্বেষীরাও বুঝি সেই রূপ কোন চিত্তবিকারে প্রলাপ বলিতেছে। তিনি এইহেতু মনুষ্যমাত্রকেই মিঠা মুখে মধুর উত্তর দিয়া ভক্তির পথে ও ভগবানের দিকে আকর্ষণ করিতে যত্ন পাইতেন; এবং যে তাঁহার প্রতি নিতান্ত দুর্ব্যবহার করিতে উদ্যত হইত, তাহাকেও অবোধ আত্মীয় জ্ঞানে, আপনার বশে আনিবার নিমিত্ত, স্নেহ অনুরাগ ও নিরভিমান সৌজন্যে সুখী করিতেন,—যেন আপনার প্রাণের আনন্দ তাহাদিগের প্রাণের মধ্যে ঢালিয়া দিয়া তাহাদিগের প্রাণ জুড়াইতেন।

এই রূপ আনন্দময় সারল্য জগতে আরও কএকটি মহাত্মার জীবনে প্রতিফলিত হইয়াছে। তাঁহারা যখন বার্দ্ধক্যের চরম সীমায়, মনুষ্য তখনও তাঁহাদিগকে শিশু জ্ঞানে ভালবাসিয়াছে। তাঁহাদিগের পরিসর * ললাট পরমার্থজ্ঞানের

---

* ইংরেজী Broad শব্দ বাঙ্গালায় প্রশস্ত শব্দে অনুবাদিত হইতে পারে না। Broad অর্থ বিস্তৃত কিংবা বিস্তার যুক্ত, প্রশস্ত অর্থ

লীলাক্ষেত্রস্বরূপ প্রতীয়মান হইলেও, তাঁহাদিগের নয়ন-মাধুরী মানুষের মন ভুলাইয়াছে,—তাঁহাদিগের পীযূষ-বর্ষিণী দৃষ্টি পাষাণ-কঠিন ক্রূরতাকেও দ্রব করিয়া ফেলিয়াছে। মনুষ্য তাঁহাদিগের সে সদানন্দ মূর্ত্তি দেখিয়া আপনা হইতে ভগবানের নাম লইয়াছে, এবং ভগবান্‌কে প্রাণের মধ্যে অনন্ত-সৌন্দর্য্য, অনন্তমাধুর্য্য ও অনির্ব্বচনীয় আনন্দের প্রস্রবণ বলিয়া বুঝিয়া ভক্তির আবেশে স্তম্ভিত হইয়াছে। উদার-চরিত্র ও আনন্দবিহ্বল হরিদাস, তাদৃশ ভক্তদিগের মধ্যে উচ্চ আসন লাভ করিয়া, জননী বঙ্গভূমিকে, মানবজাতির ইতিহাসে, সম্মানিত করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু হতবুদ্ধি রামচন্দ্র খাঁ হরিদাসকে তখন চিনিতে পাইলেন না। তিনি হরিদাসের জীবনে উচ্চতা ও উদারতার এ সকল লক্ষণ এক প্রকার চক্ষে দেখিয়াও চিত্তে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। "দেশাধ্যক্ষ" রামচন্দ্র হরিদাস ঠাকুরকে তাঁহার দেশের মধ্যে একটা

শ্রেষ্ঠ, প্রশংসনীয়। যথা, "প্রশস্তা দার-কর্ম্মণি।" প্রস্থ শব্দে বিস্তার বুঝায়। যথা—"দীর্ঘে প্রস্থে সমানং চ ন কুর্য্যান্মন্দিরং বুধঃ।" বোধ হয়, এই প্রস্থ শব্দকেই অনেকে প্রশস্ত রূপে ব্যবহার করিয়া থাকিবেন।—মহাজন কবিদিগের লেখা পুরাতন বাঙ্গালার পবিত্র প্রস্রবণ। তাঁহারা প্রস্থযুক্ত এই অর্থে অনেক স্থলেই পরিসর শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। আমিও তাঁহাদিগেরই প্রদর্শিত পদ্ধতির অনুসরণে "পরিসর" লিখিলাম।

দীপ্ত বহ্নির মত শোভিত, এবং চারি দিকের উৎপীড়নের মধ্যেও "নিবাত-নিষ্কম্প" দীপশিখার ন্যায় সুস্থির দেখিয়া মনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং তাঁহাকে বিপাকে ফেলাইয়া অপমান করিবার উদ্দেশে শেষে একটা অভাবনীয় বুদ্ধি উদ্ভাবন করিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

পরীক্ষার পরিণাম।

রামচন্দ্র খাঁর অধিকারে কতক গুলি বেশ্যা বাস করিত। এখনও এ দেশে, বড় মানুষদিগের বাড়ির আশে পাশে, হাটে বাজারে এবং গোলাগঞ্জে, সর্ব্বত্রই বহুসংখ্য বেশ্যা বাস করিয়া থাকে। রামচন্দ্র খাঁ এক দিন তাঁহার বাড়ির নিকটস্থ কএকটি বেশ্যাকে আদর করিয়া ডাকাইয়া আনিলেন, এবং হরিদাস ঠাকুরের পরাভব-প্রসঙ্গে তাহাদিগের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন।

"বেশ্যাগণে কহে এই বৈরাগী হরিদাস,
তুমি সব কর ইহার বৈরাগ্যধর্ম্ম নাশ।" (কৃ)

এইরূপ কাহিনী পৌরাণিক ইতিহাসের অনেক স্থলে বর্ণিত আছে। বঙ্গদেশের আধুনিক ইতিহাসে ইহা এক অশ্রুতপূর্ব্ব নূতন কথা।

বঙ্গের সর্ব্বপ্রধান বিলাসী কবি কহিয়া গিয়াছেন,—

"লোভের দুয়ারে যদি ফাঁদ পাতা যায়,
পশু পক্ষী সাপ বাঘ কে কোথা এড়ায়।"

কবিতার এই দুই পংক্তিতে শুধু পশু পক্ষীরই কথা আছে। কিন্তু কবি, কার্য্যক্ষেত্রের প্রকৃত পরীক্ষায়, দেব ও উপদেবকেও, পশু পক্ষীর সমান বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাতে বোধ হয় যে, তিনি পৃথিবীর সকলই চিনিতেন; চিনিতেন

না কেবল দেবতা। রামচন্দ্রখাঁও দেবতা চিনিতেন না, এবং যাঁহারা মনুষ্যদেহেই দেবতার প্রকৃতি ও দেবতার কান্তি লাভ করিয়া ভগবানের আনন্দময় ভাবে আত্মহারা হইয়াছেন, তাঁহারা কিরূপ পদার্থ, তাহা তিনি বুঝিতে পাইতেন না। সুতরাং তাঁহার এই দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে, আর কেহ যাহা পারে নাই, বেশ্যা তাহা পারিবে,—বেশ্যা অতি সহজেই হরিদাসের ব্রত ভঙ্গ করিয়া তাঁহার বাসনা পূর্ণ করিতে সমর্থ হইবে।

বেশ্যাদিগের মধ্যে এক অভাগিনী, রূপ-যৌবনের সম্পদে, একটুকু বিশেষ গর্ব্বিত ছিল। সে রামচন্দ্র খাঁর চিত্তরঞ্জনের জন্য আপনা হইতেই এই ভার "গরব" করিয়া গছিয়া লইল,—পতঙ্গী আপনার পাখার বল পরখ না করিয়াই পর্ব্বতশিখরস্থ প্রজ্জ্বলিত হুতাশন নিবাইয়া ফেলিবার প্রতিজ্ঞা করিল।

" বেশ্যাগণ মধ্যে এক সুন্দরী যুবতী,
সেই কহে তিন দিনে হরিব তার মতি।"

রামচন্দ্র খাঁর বিলম্ব সয় না। তিন দিনের কথাটা তাঁহার নিকট ভাল লাগিল না। তাঁহার ইচ্ছা, তিনি ঐ স্থানে ঐ মুহূর্ত্তেই হরিদাসকে একটা কুক্রিয়াম্বিত ভণ্ড প্রমাণ করিয়া তাঁহাকে হাতে হাতে কিঞ্চিৎ শিক্ষা দান করেন; এবং মনুষ্য যেন আর কখনও ভক্তিধর্ম্মের এইরূপ কৃত্রিম ভেক ধারণ করিয়া মনুষ্যের উপর প্রভুত্ব করিবার সুযোগ

না পায়, তিনি সকলকে তাহা পরীক্ষা দ্বারা দেখাইয়া দেন।

"খান কহে মোর পাইক যাউক তোমার সনে,
তোমার সহিত একত্র তারে ধরি যেন আনে।" (কৃ)

বেশ্যা রামচন্দ্র খাঁ অপেক্ষা একটু বেশী বুদ্ধি রাখিত। বোধ হয়, তাহার প্রকৃতিতে ভাল মানুষের লক্ষণ এবং ভদ্রতার ভাগও একটুকু বেশী ছিল। সে কহিল,—

"ইহা কেমন করিয়া সম্ভব হইবে? হরিদাস আমায় চিনেন না, জানেন না। এমন অবস্থায় আমি কেমন করিয়া আপনার পাইক সঙ্গে লইয়া তাঁহার কাছে যাইব, এবং পাইক দ্বারা তাঁহাকে ধরাইয়া দিব? আমি যদি আপনার আজ্ঞাপালনে কৃতকার্য্য হই, সে কথা গুপ্ত থাকিবে না। আপনি তখন আপনার পাইক পাঠাইয়া দিবেন, এবং যাহা আপনার ইচ্ছা হয়, তাহাই অনায়াসে করিতে পারিবেন।"

এইরূপ কথোপকথনের পর, সে 'সুন্দরী যুবতী' সময় ও সুযোগের অন্বেষণে রহিল, এবং এক দিন বিবিধ বেশবিন্যাসে সুসজ্জিত হইয়া, রাত্রিকালে হরিদাস ঠাকুরের কুটীর-দ্বারে একা যাইয়া উপস্থিত হইল।

"রাত্রিকালে সেই বেশ্যা সুবেশ ধরিয়া,
হরিদাসের বাসা গেল উল্লসিত হৈয়া।" (কৃং)

বন-ভুমি, নানারূপ লতা পাতা ও বড় ছোট গাছের

ছায়ায় আচ্ছাদিত রহিয়া, সকল সময়েই সৌন্দর্য্যের এক ঔদাস্যময় গভীর-মূর্ত্তিতে পরিশোভিত রহে। তাহাতে রাত্রিকাল। আকাশের চন্দ্র তারা আকাশে হাসিতেছে। চন্দ্রের স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না এবং নক্ষত্রনিচয়ের মিটি মিটি আলো, তরুলতার পত্রাচ্ছাদন ভেদ করিয়া এখানে ওখানে এলাইয়া পড়িয়াছে। কোন কোন বৃক্ষ, গায়ে একটুকু বেশী জ্যোৎস্না মাখিতে পাইয়া, ধবলমূর্ত্তি দেব-বিগ্রহের ন্যায়, শোভা পাইতেছে; কোনটি বা অদূরে আঁধারে পড়িয়া শরীর-বদ্ধ শোকের ন্যায় ম্রিয়মাণ রহিয়াছে। এ দৃশ্য মনুষ্যজগতে কাহার হৃদয়কে না স্পর্শ করে? বোধ হয়, প্রকৃতির এই অপরূপ নৈশ-মূর্ত্তি সে বেশ্যার হৃদয়কেও একটুকু দ্রব করিল। বেশ্যা সেই নির্জ্জন বনে, কুটীরের দ্বার-দেশে উপস্থিত হইয়া, আগে তুলসী তলায় নমস্কার করিল; তার পর, হরিদাসকে নমস্কার করিয়া, কুটীরের দুয়ারে যাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

"তুলসী নমস্করি হরিদাসের দ্বারে যাঞা,
গোসাঞিরে নমস্করি রহিল দাঁড়াইয়া।" (ক্র)

বেশ্যা হরিদাসকে আর কখনও দেখে নাই। এই তাহার প্রথম দর্শন। সে দেখিল,

"ঠাকুর পরমসুন্দর প্রথম যৌবন।"

হরিদাসের প্রতি তাহার ভক্তি না জন্মিলেও, তাহার

চিত্ত প্রথম দর্শনেই আকৃষ্ট হইল। সে সেই বনবাসী সন্ন্যাসীর দেহে রূপযৌবনের অমন উচ্ছলিত মাধুরী দেখিয়া প্রকৃতই একটুকু মোহিত হইল, এবং হরিদাসকে তৃষিত-নয়নে দেখিতে লাগিল। আর হরিদাস! হা তুমিও কি আজি ক্ষণকালের তরে তোমার জপ-যজ্ঞে বিরত হইয়া, তোমার ঐ প্রেমার্দ্রনয়নে বেশ্যার পাপমুখ নিরীক্ষণ করিলে?

হরিদাস ঠাকুরের বয়স, এই সময়ে সম্ভবতঃ পঁয়ত্রিশ। কিন্তু তিনি তাঁহার জ্ঞানের প্রখরতায় এবং হৃদয়-নিহিত ভক্তি ও প্রীতির অসামান্য গাম্ভীর্য্যে, এই বয়সেই বয়োবৃদ্ধ সিদ্ধপুরুষদিগের ন্যায় ধীর ও স্থির। তিনি আগন্তুক অবলার মুখচ্ছবি দেখিয়াই তাহার মনের ভাব বুঝিতে পাইলেন, এবং তাহার প্রতি অণুমাত্রও ঘৃণা কিংবা বিরক্তি না দেখাইয়া বরং একটুকু আদর করিলেন,—তাহাকে তাঁহার স্বাভাবিক মধুর ভাষায় সম্ভাষণ করিয়া দুয়ারে বসিতে উপদেশ দিলেন।

যাঁহারা বেশ্যার নামমাত্র শ্রবণেই ভয়, বিদ্বেষ অথবা ঘৃণার একটা বিচিত্র অভিনয় দ্বারা আপনাদিগের উচ্চতা প্রদর্শন করেন, বেশ্যার প্রতি হরিদাসের এইরূপ আদর ও স্নেহময় ব্যবহার তাঁহাদিগের কাছে ভাল না লাগিতে পারে। তাঁহারা অবশ্যই সাধুসজ্জন ও সুনীতিপরায়ণ ধার্ম্মিক লোক। তাঁহাদিগের জীবন সর্ব্বতোভাবে পবিত্র।

কে তাঁহাদিগের নিন্দা করিবে? কিন্তু ইহাও এক এক বার মনে লয় যে, তাদৃশ ধার্ম্মিক ব্যক্তিরা, আত্মজীবনের ধর্ম্মোন্নতি এবং আত্মমহিমা সম্পর্কে যেরূপ মুগ্ধ, বুঝি তাঁহারা অনন্ত করুণাময় ও অমৃত-মধুর জগদীশ্বরের মহিমার ভাবে তেমন মুগ্ধ নহেন। কারণ, সূর্য্য ও চন্দ্র যাঁহার জ্যোতি অথবা কান্তি লইয়া উজ্জ্বল কিংবা আনন্দময়, খদ্যোতও তাঁহারই দ্যুতিতে দ্যুতিমান্; এবং যিনি সাবিত্রীর হৃদয়ে শত-সূর্য্য-সমুজ্জ্বল পবিত্রপ্রভায় প্রতিভাত হইয়াছিলেন, ভিখারিণী বেশ্যার হৃদয়েও তিনিই অলক্ষিতভাবে ও প্রাণ-দেবতা রূপে বিরাজমান। পৃথিবীর প্রত্যেক বেশ্যাই যে, অনন্ত জীবনের কোন এক সোপানে সাবিত্রীর স্বর্গীয় পবিত্রতা ও পুণ্য-পুঞ্জ-শোভি প্রেমভক্তি লাভ করিবে না, তাহা কে বলিতে পারে? আর, যে সকল জন্মদুঃখিনী অদ্যাপি প্রত্যক্ষ নরকে ডুবিয়া রহিয়া মানবসমাজের পাপের বোঝা বহন করিতেছে, তাহাদিগের হৃদয়েও যে সময়ে সময়ে স্বর্গের শীতল সমীর প্রবাহিত হয় না,—স্বর্গ-দুর্ল্লভ ভক্তি এবং দয়া-ধর্ম্ম অথবা দীন-হীনভাবের স্ফুরণ হইয়া থাকে না, ইহা কে সাহস করিয়া বলিবে? ভক্তের প্রকৃতি ও চিত্তবৃত্তি, এই জন্যই, সাধুসজ্জন ও পূজার্হ ধার্ম্মিক ব্যক্তিদিগের রীতি নীতি হইতে একটুকু পৃথক্। সাধু ও ধার্ম্মিক ব্যক্তিরা যাহাদিগকে ঘৃণা করেন, দীনভাবাপন্ন ভক্তগণ, দীনবন্ধুর দিকে চাহিয়া,

তাহাদিগকে শ্রদ্ধা করেন,—তাহাদিগকেও ভাল বাসেন। তাঁহাদিগের এই দৃঢ় বিশ্বাস যে, এ জগতের কীট হইতে কোটীশ্বর পর্য্যন্ত সকলই যখন ভগবানের নিজ-জন ও নিজ-ধন, তখন ভক্তও সকলকেই তাঁহার সম্পর্কে আপনার বলিয়া ভালবাসিবে, এবং দেবত্ব ও দেব ধামের ভাবী অধিকারী জ্ঞানে সম্মান করিবে। নহিলে সে ভগবানে অনুরক্ত ও তদ্গত ভক্ত নহে।

আজি সমগ্র ইয়ুরোপ এবং আমেরিকা যাঁহার নাম লইয়া জগদীশ্বরকে ডাকিতেছে, তিনি মনুষ্যকে ভক্তির এই অনির্ব্বচনীয় তত্ত্ব বুঝাইয়া ছিলেন। হরি-প্রেম-মগ্ন মহাসত্ত্ব হরিদাসও ভক্তির এই অমূল্য তত্ত্ব হৃদয়ে অনুভব করিয়া জীবমাত্রকেই ভালবাসিতে শিখিয়াছিলেন। তিনি সে বেশ্যাকেও ঘৃণা করিতে পারিলেন না। তাহাকে ভাল-বাসার স্নিগ্ধকণ্ঠে আদর করিয়া বলিলেন,—"আমি প্রতি রাত্রিতে নিয়মিত সংখ্যায় নাম-জপ করিয়া থাকি। আমার যত ক্ষণ না সে সংখ্যা পূর্ণ হয়, তুমি তত ক্ষণ ঐ স্থানে বসিয়া হরি-নাম কীর্ত্তন শুনিতে থাক; আমি তার পর তোমার প্রীত্যর্থে আলাপ করিব।"

"নির্ব্বিকার হরিদাস গম্ভীর আশয়,
বলিতে লাগিলা তারে হইয়া সদয়।
সংখ্যা নাম-সংকীর্ত্তন মহাযজ্ঞ মনে,
তাহাতে দীক্ষিত আমি হই রাত্রি দিনে।

দ্বারে বসি শুন তুমি নাম-সংকীর্ত্তন,
নাম সমাপ্ত হইলে করিব প্রীতি-আচরণ।" (ক্র)

বেশ্যা অপ্রস্তুত হইয়া বসিয়া রহিল। হরিদাস নাম-কীর্ত্তনে আত্ম-বিস্মৃত হইলেন। রাত্রি দেখিতে দেখিতে প্রভাত হইল। বেশ্যা সমস্ত রাত্রি ঐ ভাবে বসিয়া হরিনাম শুনিয়াছিল। সে প্রভাত সময়ে, যেন লজ্জায় একটুকু অপ্রা-তিভ হইয়া, ধীরে ধীরে বাড়ি চলিল। যাইবার সময় এই মাত্র বলিয়া গেল যে, সে কল্য আবার সাক্ষাৎ করিবে। ঠাকুর হরিদাসও তাহাতে প্রীতির সহিত সম্মতি দিলেন।

"প্রাতঃকাল দেখি বেশ্যা উঠিয়া চলিলা,
সমাচার রামচন্দ্র খানেরে কহিলা।" (ক্র)

রামচন্দ্র খাঁ, রাত্রির সমস্ত সমাচার বেশ্যার প্রমুখাৎ অবগত হইয়া, ভেক বঞ্চিত ভুজঙ্গবৎ যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং তাহাকে দ্বিতীয় রাত্রিতে অধিকতর উৎসাহের সহিত পাঠাইয়া দিলেন। সে রাত্রিও প্রথম রাত্রির ন্যায় নাম শ্রবণেই অতিবাহিত হইল, এবং বেশ্যা, আপনার ফুটন্ত রূপ—ফুল্ল যৌবন উভয়কেই ধিক্কার দিয়া, প্রভাত সময়ে নিরাশ হৃদয়ে বাড়ি চলিয়া গেল। সে হরিদাস ঠাকুরের মন ভুলাইবার জন্য সেই রাত্রিতে, ভক্তির ভাণ করিয়া, অনেক বার হরিনাম উচ্চারণ করিয়াছিল। বাড়ি যাইবার সময় সে কথা পুনঃ পুনঃ তাহার মনে পড়িল। হরিনামে

তাহার কাছে কেন এত মিষ্ট লাগিয়াছিল, এই প্রশ্ন তাহার প্রাণটাকে একটুকু বিচলিত করিল। কিন্তু জীব-হৃদয়ের অন্তর্য্যামী দয়াময় জগদীশ্বরের ইচ্ছায় তাহার জীবনে, তৃতীয় রাত্রিতে, এক অসম্ভাবিত ঘটনা উপস্থিত হইয়া মনুষ্যের বিস্ময় জন্মাইল। যেখানে কতকগুলি দগ্ধ কঙ্কর স্তূপীকৃত রহিয়াছিল, সেখানে অকস্মাৎ ভাগীরথীর তরঙ্গ বহিল।

সে বেশ্যা প্রতিদিনই যেমন নানারূপ সাজ সজ্জা করিয়া, সন্ধ্যাকালে হরিদাস ঠাকুরের কাছে যায়, আজিও সেই ভাবে ও সেই রূপে, বেণাপোলের সেই বনে, কুটীরের দ্বারে একাকিনী যাইয়া উপস্থিত হইল, এবং পূর্ব্বের মত তুলসী ও হরিদাসকে নমস্কার করিয়া দ্বারদেশে বসিয়া নাম শুনিতে লাগিল। আজি দুই এক বার আপনিও একটুকু শ্রদ্ধার সহিত হরিনাম উচ্চারণ করিল।

"তুলসী ও ঠাকুরকে নমস্কার করি,
দ্বারে বসি নাম শোনে বলে হরি হরি।" (কৃ)

হরিদাস তাহাকে স্নেহের ভাবে বলিলেন,—"আমি প্রতি মাসে এক কোটি হরিনাম জপ করি, ইহাই আমার জীবনের যজ্ঞ। আজি মাস শেষ হইতেছে, তাই রাত্রি শেষ হইবার পূর্ব্বে মাস-সঙ্কল্পের কোটি নাম পূর্ণ হইবে। আমি আমার এই নিয়ম-সংখ্যা পূর্ণ করিতে পারি নাই বলিয়াই তোমার সহিতও আলাপ করিবার সুযোগ পাই নাই।

তুমি ঐ স্থানে অমনই উপবিষ্ট রহিয়া নাম-কীর্ত্তন শ্রবণ কর; তাহাতে আমার প্রীতি জন্মিবে; তোমারও প্রাণ জুড়াইবে।”

বেশ্যার প্রাণ হরিদাসের প্রিয় ব্যবহারে যেন একটুকু দ্রব হইয়া আসিতেছিল। সে আজি বেশী মনোযোগের সহিত নাম শুনিতে লাগিল। হরিদাস সে বনভূমির নিস্তব্ধতার মধ্যে, অশ্রুসিক্তনয়নে, অতি কাতর মনে হরি হরি হরি বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন; এবং ঐ যে সুন্দরী যুবতী একাকিনী তাঁহার কাছে বসিয়া, তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিয়াছে, তিনি ভক্তির প্রাণভরা উচ্ছ্বাসে তাহারই জন্য পুনঃ পুনঃ করুণ-হৃদয়ে প্রার্থনা করিলেন। বোধ হয়, তাঁহার সে করুণস্বর করুণাসিন্ধু দীনবন্ধুকে আকর্ষণ করিল,—ভক্তের সে প্রাণ-নিঃসৃত পবিত্র প্রার্থনা অনন্ত লীলাময় ভক্তবৎসল অনন্তদেবের কাছে পঁহুছিল।

বেশ্যা সমস্ত রাত্রি নীরব-নিস্পন্দ ভাবে নাম-কীর্ত্তন শুনিয়াছিল। সে আগে কপট-কৌশলে,—তার পর কৌতূহলে, প্রথম দুই রাত্রি হরিদাসের প্রতি কিছু কিছু ভক্তি এবং নাম কীর্ত্তনেও কিঞ্চিৎ অনুরাগ প্রদর্শন করিয়া, আজিকার রাত্রির আরম্ভ হইতেই কেমন একটা অচিন্তনীয় আবেশ অনুভব করিতেছিল। এখানে কি করিতে আসিলাম? আসিয়াইবা কি করিলাম, এইরূপ চিন্তা তাহার

চিত্তকে মাঝে মাঝে বড় বেশী আলোড়ন করিয়াছিল; অথচ সে তাহার সম্মুখে চক্ষে যাহা দেখিতেছিল, এবং কানে যাহা শুনিতেছিল, তাহাতেও তাহার প্রাণটা কখনও ভয়ে, কখনও বিস্ময়ে, কখনও বা অনির্ব্বচনীয় আনন্দস্ফূর্ত্তিতে, থর থর কাঁপিয়াছিল। হরিদাসকে সে আগে দেখিয়াছিল, রমণী-মনোহর নবীন যুবা; এখন দেখিল ধ্যান-মগ্ন বৃদ্ধ যোগী। রাত্রি ক্রমেই বাড়িতে লাগিল, এবং তাহার হৃদয়ও ক্রমেই যেন ক্ষণে অবশ, ক্ষণে অস্থির, এবং ক্ষণে ক্ষণে স্তম্ভিত হইল। কিন্তু রাত্রি পোহাইয়া আসিতেছে,—ঊষার স্নিগ্ধ মোহন সোনালু আভা বড় বড় গাছের মাথার উপর গড়াইয়া পড়িয়া পাতায় পাতায় ঝিকি মিকি করিতেছে,—বনের পাখী নিজ নিজ কুলায়ে বসিয়া, যেন সে ঊষারই স্তুতিবন্দনায় 'প্রভাতী' গাইতেছে, ঠিক এমনই সময়ে সে পরাধীনা পাপীয়সী ভাবাবেশে বিহ্বল হইয়া, ধূলায় লুটাইয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল। সে হরিদাসের চরণোপান্তে পুনঃ পুনঃ লুণ্ঠিত হইয়া, আর্ত্তস্বরে বলিল,——

"ঠাকুর তুমি আমার গুরুদেব। তুমি আমায় উদ্ধার কর। আমি নারকিণী, বেশ্যাবৃত্তির নরকে ডুবিয়া, নিজের ইহকাল ও পরকাল খাইয়াছি; অবশেষে হতবুদ্ধি রামচন্দ্র খাঁর আজ্ঞাক্রমে তোমার সর্ব্বনাশ করিতে আসিয়া আপনি আপনার সর্ব্বনাশ করিয়াছি। আমি আমার পরিত্রাণের

সকল পথই এইরূপে খুয়াইয়া বসিয়াছি। এইক্ষণে তুমি নিস্তার না করিলে আমার আর নিস্তার নাই।”

> “দণ্ডবৎ হৈয়া পড়ে ঠাকুর-চরণে,
> রামচন্দ্র খানের কথা কৈল নিবেদনে।
> বেশ্যা হৈয়া মুই পাপ করিয়াছি অপার,
> কৃপা করি কর মুই অধমে নিস্তার।” (কৃ)

ঠাকুর হরিদাসের ভক্তি সর্ব্বভূতে দয়াময়ী। বেশ্যার এ বিচিত্র পরিবর্ত্ত তাঁহার নিকট ভগবানের প্রত্যক্ষ ক্রীড়া বলিয়া প্রতিভাত হইল,—তাঁহার দয়ার হৃদয় বেশ্যার কাতর-বিলাপে দর-দর ধারায় প্রবাহিত হইল। তিনি তাহাকে নানারূপ আশ্বাস ও উপদেশ দিয়া শেষে বলিলেন,—

“দেখ বাছা! রামচন্দ্র খাঁ নিতান্ত অবোধ ও মূর্খ। আমি যে তাঁহার কোন প্রকার অত্যাচারেও মনে দুঃখ বোধ করি নাই, তাহা শুধুই তাহার মূর্খতার কথা মনে করিয়া। আমি রামচন্দ্রের সমস্ত অভিসন্ধি পূর্ব্ব হইতেই বুঝিতে পাইয়াছি। তুমি যে দিন এখানে প্রথম আসিয়াছ, আমি সেই দিনই এই পাপ-স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতাম; তথাপি যে তিনটি দিন এখানে রহিয়াছি, তাহা দয়াময় হরির ইচ্ছায়, এবং কেবল তোমারই মঙ্গলের উদ্দেশ্যে।”

> “ঠাকুর কহে খানের কথা সব আমি জানি,
> অজ্ঞ—মূর্খ, সেই তারে দুঃখ নাহি মানি।

সেই দিন যাইতাম এ স্থান ছাড়িয়া,
তিন দিন রহিলাম তোমার লাগিয়া।" (কৃ)

বেশ্যা কহিল,—"ঠাকুর! তোমার সকলই আমি বুঝিয়াছি। এইক্ষণ আমার কি কর্ত্তব্য হইতেছে, এবং কিসে আমার এই ভব-ভয়-ক্লেশ দূর হইতে পারে, তুমি আমায় তাহাই উপদেশ কর।"

" বেশ্যা কহে কৃপা করি কর উপদেশ,
কি মোর কর্ত্তব্য যাতে যায় ভব-ক্লেশ।" (কৃ)

হরিদাস ভগবানের অনন্ত করুণায় বিশ্বাস করিতেন। তিনি ইহা জানিতেন যে, পাপীর পুঞ্জীকৃত পাপ অপেক্ষাও ভগবানের নাম এবং তাঁহার করুণার মহিমা অনন্তগুণে বড়। তিনি যখন সে বেশ্যার অশ্রুসিক্ত মুখচ্ছবির দিকে চাহিয়া বুঝিলেন যে, ভগবানের কৃপায় তাহার বুকের ভিতর অনুতাপের আগুন জ্বলিয়াছে, এবং তাহার পাপের বোঝা ভস্মীভূত হইয়া উড়িয়া গিয়াছে,—তিনি যখন প্রত্যক্ষ দেখিলেন যে, তাহার পাপ-কঠোর পাষাণ আত্মা, ভক্তির অমৃতসেকে, আর্দ্র হইয়াছে, তখন আর তাঁহার উপদেশ দিতে ক্লেশ বোধ হইল না। বেশ্যা যেমন ভগবৎকৃপার উচ্চ ভূমিতে উঠিয়া উপদেশ চাহিয়াছিল, তিনিও উচ্চ ভূমিতেই দণ্ডায়মান রহিয়া উপদেশ করিলেন,—"তোমার পাপার্জ্জিত বিত্ত-সম্পত্তি ব্রাহ্মণ ও দুঃখী কাঙ্গালকে বিলাইয়া দেও, গৃহবাসের

সমস্ত বাঁধনি ছিঁড়িয়া ফেল, তোমার ঐ বেশ, ঐ ভূষা পরিত্যাগ কর, এবং এই নির্জ্জন স্থানে আশ্রয় লইয়া নিরন্তর নামকীর্ত্তনে নিবিষ্ট হও। তুমি ইহা করিলেই অচিরে শ্রীকৃষ্ণের চরণ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইবে।"

"ঠাকুর কহে ঘরের দ্রব্য ব্রাহ্মণে কর দান,
এই ঘরে আসি তুমি করহ বিশ্রাম।
নিরন্তর নাম লও তুলসী সেবন,
অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ।" (কৃ)

ঠাকুর হরিদাসের ভক্তি যেমন জীবন্ত-বস্তু, উপদেশও সেইরূপ সজীব-শক্তি। তিনি বেশ্যাটিরে, এই সকল কথা ভাল করিয়া বুঝাইয়া, তাহাকে নাম-সাধনের প্রণালী বিষয়ে গুরুর ভাবে শিক্ষা দিলেন; তার পর হরিনাম লইতে লইতে সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া আর এক দিকে চলিয়া গেলেন।

"এত বলি তারে নাম উপদেশ করি,
উঠিয়া চলিলা ঠাকুর বলি হরি হরি!" (কৃ)

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভগবানের কৃপা হইলে বাজারের বেশ্যাও, মূর্ত্তিমতী তপস্যার ন্যায়, দেবতার পবিত্র আসন লাভ করিতে পারে। রামচন্দ্র খাঁর প্রেরিত বেশ্যাও হরিদাসের সমস্ত কথাই গুরুর উপদেশ জ্ঞানে অক্ষরে অক্ষরে পালন করিল। সে তাহার বেশ ভূষা পরিত্যাগ করিয়া মাথা মুড়াইল, বিত্ত সম্পত্তি লুটাইয়া দিয়া ভিখারিণী সাজিল,

এবং হরিদাসের ঐ পরিত্যক্ত কুটীরে আশ্রয় লইয়া, তাঁহারই অনুকরণে, অহোরাত্র তিন লক্ষ হরিনামকীর্ত্তনরূপ মহাব্রত অবলম্বন করিল। যে কিছু দিন পূর্ব্বে বেশ্যা ছিল, সে এই ভাবে বহু লোকের মাতৃস্থানীয় "মহন্তী" হইয়া সকলকেই আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল, এবং তাহার এই অচিন্তনীয় রূপান্তরে চারি দিকের সমস্ত লোকই ভক্তির জয় প্রত্যক্ষ করিয়া হরিদাসের উদ্দেশে, বিস্ময়ে মাথা নোয়াইল।

"তবে সেই বেশ্যা গুরুর আজ্ঞা লইল,
গৃহ বৃত্তি যেবা ছিল ব্রাহ্মণেরে দিল।
মাথা মুড়ি এক বস্ত্রে রহিলা সেই ঘরে,
রাত্রি দিনে তিন লক্ষ নাম গ্রহণ করে।
তুলসী সেবন করে চর্ব্বণ উপবাস,
ইন্দ্রিয় দমন হৈল, প্রেমের প্রকাশ।
প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবী হৈল পরম মহন্তী,
বড় বড় বৈষ্ণব তার দর্শনেতে যান্তি।
বেশ্যার চরিত্র দেখি লোকে চমৎকার,
হরিদাসের মহিমা কহে করি নমস্কার।" (কৃ)

হরিদাস ঠাকুর জীবনের কোন সময়েও নাম ও যশের জন্য তৃষিত হন নাই। যদি তিনি কুত্রাপি কখনও আপনার যশ কানে শুনিতে পাইতেন, তাহা হইলে ভয়ে জড়ীভূত হইয়া ভগবানের দিকে চাহিতেন। কিন্তু, তাঁহার ইচ্ছায়

কি হইবে? এ বেশ্যার বিচিত্র কাহিনীতে, বঙ্গদেশের অনেক স্থলেই, তাঁহার প্রাতঃস্মরণীয় নাম ছড়াইয়া পড়িল,— তাঁহার নামে জয়-জয়-ধ্বনি হইল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

চাঁদপুরে ও সপ্তগ্রামে।

যে সময়ে রামচন্দ্র খান দক্ষিণ বঙ্গের "দেশাধ্যক্ষ," সেই সময়ে হিরণ্য দাস ও গোবর্দ্ধন দাস নামক দুইটি স্বনামধন্য কায়স্থ ভূম্যধিকারী, এখনকার হুগলীর অতি নিকটে, পুরাতন সরস্বতীর তটে, সপ্তগ্রামনামক সুপ্রসিদ্ধ নগরে গৌড়েশ্বর হুসেন সাহার প্রতিনিধি কার্য্যাধ্যক্ষ। সপ্তগ্রাম তখন বাণিজ্যের সর্ব্বপ্রকার সুখ-সম্পদে বঙ্গের সর্ব্বপ্রধান বন্দর, এবং রাজধানী না হইয়াও, অসংখ্য সমৃদ্ধ ধনীর নিবাস হেতু, বঙ্গীয় ধন-সম্পত্তি ও বিলাস-বৈভবের সুপ্রসিদ্ধ নগর।

এখন যেমন ইংরেজ ও ফরাসী প্রভৃতি ইয়ুরোপীয় বণিকেরা কলিকাতায় মোকাম করিয়া বঙ্গদেশের সহিত বাণিজ্যের সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করেন, রোমক ও পর্ত্তুগীজ প্রভৃতি পূর্ব্বতন ইয়ুরোপীয় বণিকেরাও পূর্ব্বে সপ্তগ্রামে থাকিয়াই সেইরূপ বাণিজ্য করিতেন। সপ্তগ্রামের নগরপথ ঘনসন্নিবিষ্ট অট্টালিকার শোভায় দেশী বিদেশী সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিত, এবং নগরবাহিনী সরস্বতীও নানাজাতির অর্ণবপোত ও ব্যবসায়ের ডিঙ্গায় অলঙ্কৃত রহিয়া সর্ব্বদা খল খল হাসিত।

সাতটি বড় বড় গ্রাম লইয়া এই নগরের পত্তন হয়; এই জন্য ইহার নাম সপ্তগ্রাম। ইহার প্রচলিত নাম সাঁতগাঁ।

ইহার অধিবাসিদিগের মধ্যে সকল লোকেই বিষয়-বাণিজ্যের কথা ভাল বুঝিত, স্বাধীন ব্যবসায় দ্বারা প্রচুর উপার্জ্জন করিত, এবং পরিচ্ছদের পারিপাট্যে, বেশবিন্যাসের বৈচিত্র্যে ও ভাষার পরিশুদ্ধ মাধুর্য্যে এ দেশের সর্ব্বত্রই অতি সুসভ্য লোক বলিয়া সম্মানিত হইত। যাহারা সে কালে ভাল বাঙ্গালায় কথা কহিতে চাহিত, তাহারা সাধারণতঃ সাত-গেঁয়ে শব্দ এবং সাতগেঁয়ে উচ্চারণ প্রণালীর অনুসরণ করিতে পারিলেই আনন্দ অনুভব করিত। হিরণ্যদাস ও গোবর্দ্ধন-দাস এই সপ্তগ্রামের আশ্রয় ও আভরণ স্বরূপ ছিলেন।

হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন সহোদর ভ্রাতা। হিরণ্য জ্যেষ্ঠ, গোবর্দ্ধন কনিষ্ঠ। তাঁহারা ঐ প্রদেশে গৌড়েশ্বর হুসেন সাহার ইজারাদার কিংবা প্রতিনিধিরূপে সম্ভবতঃ চব্বিশ লক্ষ টাকা রাজকর তহশীল করিতেন, এবং তাহা হইতে বাদ-শাহকে বার লক্ষ টাকা রাজস্ব দিয়া আপনারা অবশিষ্ট বার লক্ষ পারিশ্রমিক স্বরূপ প্রাপ্ত হইতেন। তখনকার এই বার লক্ষ, অর্থের প্রকৃত মূল্য অনুসারে এখনকার অর্দ্ধকোটি হইতেও বেশী। কিন্তু হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন উভয়েই অর্থের সদ্ব্যবহার জানিতেন। তাঁহারা পরকে না খাওয়াইয়া আপ-নারা খাইতেন না, পরের দুঃখ দূর করিবার জন্য যথাশক্তি যত্ন না করিয়া আপনারা কখনও কোন রূপ সুখের সামগ্রী ছুঁইতে চাহিতেন না। ফলতঃ, দেশের দীন দুঃখী ও অস-

গ্রাম ব্যক্তিরা হিরণ্য ও গোবর্দ্ধনকে পিতা মাতার ন্যায় আপনার জন জ্ঞানে ভালবাসিত, এবং যাহার যখন যে কোন বিপদ কিংবা কষ্ট উপস্থিত হইত, সে-ই তখন হিরণ্য অথবা গোবর্দ্ধনের কাছে উপস্থিত হইলে, তাহা হইতে রক্ষা পাইত।

নবদ্বীপের নিরাশ্রয় পণ্ডিতবর্গও হিরণ্য ও গোবর্দ্ধনের স্নেহের আশ্রয় পাইয়াই এ সময়ে হিন্দু রাজার অভাবদুঃখ কতকটা বিস্মৃত হইয়াছিলেন, এবং তাঁহারা সকলেই সপ্তগ্রামের এই দুই সদাশয় পুরুষের নিকট হইতে যথাসম্ভব বৃত্তি ও ব্রহ্মোত্তর লাভে পরিতুষ্ট হইয়া অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় নিবিষ্ট ছিলেন। বৈষ্ণব কবিরা, হিরণ্য ও গোবর্দ্ধনকে ধার্ম্মিকের অগ্রগণ্য বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। ইহাতে বোধ হয় যে, বঙ্গদেশের যে সকল ধনী ও মানী ব্যক্তি নবদ্বীপস্থ ভক্তিসভার টানে পড়িয়া কৃষ্ণপ্রেমে আকুল হইয়াছিলেন, হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন তাঁহাদিগের মধ্যে প্রধান আসন পাইবার যোগ্য। যথা, চরিতামৃতে,—

"হিরণ্য গোবর্দ্ধন দাস দুই সহোদর,
সপ্তগ্রামে বার লক্ষ মুদ্রার ঈশ্বর।
মহৈশ্বর্য্য যুক্ত দোঁহে বদান্য ব্রাহ্মণ্য,
সদাচার, সৎকুলীন, ধার্ম্মিক অগ্রগণ্য।
নদীয়াবাসী ব্রাহ্মণের উপজীব্য প্রায়,
অর্থ ভূমি গ্রাম দিয়া করেন সহায়।

হিরণ্য ও গোবর্দ্ধনের এক পুরোহিত ছিলেন। তাঁহার নাম বলরাম আচার্য্য। তাঁহার নিবাস-স্থলের নাম চাঁদপুর। চাঁদপুর সপ্তগ্রাম নগরের অতি সন্নিহিত সামান্য এক খানি পল্লীগ্রাম। কিন্তু শান্তিপ্রিয় বলরাম, ঐ স্থানটিকেই তাঁহার শান্তিনিকেতন জ্ঞানে, হৃদয়ের সহিত ভালবাসিতেন, এবং ঐ স্থলে থাকিয়া তাঁহার ছাত্রদিগকে, অন্যান্য শাস্ত্রের সঙ্গে, ভক্তিশাস্ত্রের উপদেশ করিতেন। পুরোহিত বলরাম ভক্তি-শাস্ত্রে যেমন প্রগাঢ় পণ্ডিত, ভক্তের প্রাণ-প্রিয় অনুষ্ঠান-নিচয়েও তেমনই অনুরক্ত ছিলেন। তাঁহাকে, এই হেতু, ঐ প্রদেশের সকলেই খুব শ্রদ্ধা করিত, এবং হিরণ্য ও গোব-র্দ্ধনও বিশেষ সম্মান করিতেন।

বলরাম তাঁহার চাঁদপুরের বাড়িতে বসিয়া আছেন এমন সময়ে তাঁহার নিকটে সংবাদ পঁহুছিল যে, ঠাকুর হরিদাস তাঁহার দুয়ারে। তিনি হরিদাসের নাম অনেক দিন হইতেই লোকের মুখে মুখে পরিজ্ঞাত হইয়া, তাঁহাকে হৃদয়ের সহিত ভক্তি করিতেছিলেন, এইক্ষণ তাঁহাকে চক্ষে দেখিয়া আপ-নাকে আপনি কৃতার্থ মনে করিলেন।

চাঁদপুর আর বেণাপোল বহুদিনের পথ। হরিদাস বেণাপোলের বনবাস ত্যাগের পর কএক বৎসর দেশে দেশে পরিভ্রমণ করিয়া, শেষে কি উদ্দেশ্যে সহসা চাঁদপুর আসিয়া অতিথি হইলেন, তাহা বুঝা যায় না। কিন্তু তিনি চাঁদ-

পুরের প্রশান্ত মূর্ত্তি দেখিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করিলেন, এবং বলরামের অকৃত্রিম প্রীতি ও অমায়িক পরিচর্য্যায় প্রাণ জুড়াইবার সুযোগ পাইলেন। বলরাম আচার্য্য হরিদাসের আশ্রমের জন্য একটি নির্জ্জন পর্ণশালা নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন, এবং হরিদাস সেই পর্ণশালায় স্থান লইয়া রামচন্দ্র খাঁর সমস্ত অত্যাচার ভুলিয়া গেলেন। তিনি সেই পর্ণ-কুটীরে হৃদয়ের আনন্দে বিভোর রহিয়া দিবা রাত্রি তাঁহার হৃদয়হারী হরির নাম জপ করিতেন, এবং দিবসের কোন এক সময়ে বলরামের ঘরে যাইয়া ভিক্ষা নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেন।

"হরিদাস ঠাকুর চলি আইলা চাঁদপুরে,
আসিয়া রহিলা বলরাম আচার্য্যের ঘরে।
হিরণ্য গোবর্দ্ধন দুই মুলুকের মজুমদার,
তাঁর পুরোহিত বলরাম নাম তাঁর।
হরিদাসের কৃপাপাত্র তাতে ভক্তি মানে,
যত্ন করি ঠাকুরেরে রাখিল সেই গ্রামে।
নির্জ্জন পর্ণশালায় করেন কীর্ত্তন,
বলরাম আচার্য্য গৃহে ভিক্ষা নির্ব্বাহন।" (কৃ)

এই পৃথিবীর অনেক লোক ভক্তির আনন্দনিবাসে অবস্থিত এবং বৈরাগ্যের বেশ-ভূষায় আবৃত হইয়াও, বিষয়-তৃষ্ণার বিষ-বিকারে নিরন্তর জর্জ্জরিত রহে; অনেকে আবার বিষয়-সুখের সমুদ্র মধ্যে নিমগ্ন রহিয়াও প্রাণভরা

ভক্তি, পরোপকারিতা, এবং সারল্য, সৌজন্য ও বিনয় প্রভৃতি বিবিধ গুণে বহু লোকের প্রাণের মধ্যে প্রিয় আসন যুড়িয়া বসে। সপ্তগ্রামের হিরণ্য দাস ও গোবর্দ্ধন দাস সর্ব্বাংশেই এই শেষোক্ত শ্রেণির লোক ছিলেন। তাঁহারা উভয়েই "মহাপণ্ডিত"। তাঁহারা যখন সভা করিয়া বসিতেন, তখন সে সভা শত শত পণ্ডিতের প্রফুল্লকান্তিতে আলোকিত হইত, এবং সকল লোকেই উহাকে অবনীতে ইন্দ্রের সভা মনে করিত।

হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন, কুল-পুরোহিত বলরামের কাছে, পূর্ব্বেই হরিদাস ঠাকুরের পরিচয় পাইয়াছিলেন। হরিদাস পুরাতন যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় ব্রত-পরায়ণ, অথচ তিনি প্রতিদিন তিন লক্ষ নাম কীর্ত্তন করেন, ইদানীং এ কথার সবিশেষ জানিতে পাইয়া, তাঁহারা যেমন প্রীত, তেমনই বিস্মিত এবং কৌতুকাবিষ্ট হইলেন। এমন কঠোর তপস্যা কি কলিকালেও সম্ভব হইতে পারে? তাঁহারা তপস্বীকে চক্ষে দেখিবার জন্য নিতান্তই উৎসুক হইয়া উঠিলেন। এ দিকে, হরিদাস কখনও কোন ধনীর কাছে যাইতেন না; কেহ কাছে আসিলেও, নয়নের স্নিগ্ধমাধুরীতে নীরব সম্ভাষণ এবং মস্তকের প্রণতভঙ্গিতে দৈন্য জ্ঞাপন পূর্ব্বক হরিনাম কীর্ত্তন ভিন্ন, অভ্যর্থনার আর কোন উপায় খুঁজিবার অবসর পাইতেন না। এইরূপ লোকের সহিত কি প্রকারে বিষয়ীর

ঘটিবে? কিন্তু হরিদাসও মজুমদারদিগের মহত্ত্বের জানিয়া তাঁহাদিগের প্রতি একটুকু অনুরক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের সে বিরাট্ সভায় ভক্তির তত্ত্বব্যাখ্যা এবং ভগবানের নাম-মহিমা কীর্ত্তন করা তাঁহার গূঢ় অভি-সন্ধি ছিল। সুতরাং বলরাম আচার্য্য যখন তাঁহার কাছে বিশেষ রূপ অনুরোধ করিলেন, তখন তিনি প্রীতির সহিত সম্মত হইলেন, এবং সভাদর্শনের নির্দ্ধারিত দিবসে বলরামকে সঙ্গে লইয়া তথায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন।

সভার চারিদিকে পংক্তির পর লোকের পংক্তি। মধ্য-মণ্ডপে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতবর্গ, এবং তাঁহাদিগের মধ্য-স্থলে, দুইটি দিক্‌পালের ন্যায়, দিগন্ত-বিশ্রুত-নামা হিরণ্যদাস ও গোবর্দ্ধনদাস। বঙ্গদেশের সমস্ত সাধু শিষ্ট ব্যক্তিই হরি-দাসকে এ সময় ঠাকুর বলিয়া সম্ভাষণ করিতেন। হিরণ্য ও গোবর্দ্ধনদাসও তাঁহাকে ঠাকুর বলিয়া জানিতেন। তাঁহারা ঠাকুর হরিদাসের দর্শনমাত্রই সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান হইলেন, এবং ভারতীয় রাজারা পুরাকালে ঋষিদিগকে যেরূপ সম্মান করিতেন, তাঁহারাও ভক্ত হরিদাসের পায়ে, সেই ভাবে নিপতিত হইয়া, সেখানকার সমবেত দর্শকবৃন্দের নিকট নিজ নিজ সৌজন্যের পরিচয় দিলেন।

"একদিন বলরাম মিনতি করিয়া,
মজুমদারের সভায় আইলা ঠাকুর লইয়া।

ঠাকুর দেখি দুই ভাই কৈল অভ্যুত্থান,
পায়ে পড়ি আসন দিল করিয়া সম্মান।" (ক্র)

জাতিতে যবন, বয়সে প্রৌঢ়যুবা, ব্যবসায়ে ভিক্ষুক এবং বিষয়সম্পর্কে বৃক্ষ-তল-শায়ী দীনের দীন; তথাপি হরিদাস হিরণ্য ও গোবর্দ্ধনদাসের সে ব্রাহ্মণবহুল বিশাল সভাগৃহে সকলের কাছেই ঠাকুরের পূজা পাইলেন। ইহার অর্থ কি? বঙ্গদেশ কি তখন হিন্দুধর্ম্মের সকল শাস্ত্র বিস্মৃত হইয়া এবং বেদ ও স্মৃতির বিধি ব্যবস্থা ভাগীরথীর জলে ভাসাইয়া দিয়া, সর্ব্বতোভাবে উচ্ছৃঙ্খল ও উন্মত্ত হইয়াছিল? তাহা নহে। বাঙ্গালি, শাস্ত্রের নিগড়ে এখন যেমন আবদ্ধ, তখনও তেমনই অবরুদ্ধ। শাস্ত্রের শাসন, বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবলতায় সময়ে, এখানে ওখানে কতকটা দুর্ব্বল হইয়া থাকিলেও, শেষে আবার, প্রবল ভাঁটার পর নূতন জোয়ারের উল্লাসের ন্যায়, ভক্তিধর্ম্মের নূতন উচ্ছ্বাসে, খুব বেশী বাড়িয়াছিল। কিন্তু শাস্ত্রে করিবে কি? পৃথিবীর সকল শাস্ত্র এক দিকে, এবং শাস্ত্রার্থের চরমলক্ষ্য প্রেমানন্দবিগ্রহ ভক্তবৎসল ভগবান্ পূর্ণস্বরূপ আর এক দিকে। তিনিই বিশ্বসংসারের প্রাণ। তিনি যখন জীববিশেষের প্রাণের মধ্যে প্রাণের ঠাকুররূপে অনুভূত হন, তখন সকলেই সে সার্থকজন্মা ভক্ত সাধককে ঠাকুর বলিয়া মাথায় তুলিয়া লয়। ইহা কোন দেশের কোন শাস্ত্রই ঠেকাইয়া রাখিতে পারে না। অঙ্গার আপনাতে আপনি

যত কেন মলিন না হউক, উহা যখন গায়ে আগুন মাখিয়া, আগুনের ন্যায় ধগ্ ধগ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে, তখন আর উহাকে অঙ্গার বলিয়া মনুষ্যের প্রতীতি থাকে না। সুতরাং হরিদাসের এ অভ্যর্থনাকে কোন অংশেও অতিচিত্রিত মনে করিবার কারণ নাই।

হিরণ্য গোবর্দ্ধনের সভায় সে সময়ে, যে সকল বড় বড় পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারাও হরিদাসের সৌম্য, শান্ত, ভক্তিসমুজ্জ্বল দিব্যমূর্ত্তি দেখিয়া চিত্তে আপনা হইতে প্রণত হইলেন, এবং সকলেই অশেষবিশেষে হরিদাসের গুণ-কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা হরিদাসের প্রতি কি রূপ ভাব অবলম্বন করেন, এ বিষয়ে হিরণ্য ও গোবর্দ্ধনের মনে প্রথমে একটুকু সংশয় ছিল। কিন্তু তাঁহারাও পণ্ডিত-দিগের তথাবিধ ব্যবহার দর্শনে যতদূর সম্ভব প্রীত হইলেন। যথা, চরিতামৃতে,—

"অনেক পণ্ডিত সভায় ব্রাহ্মণ সজ্জন,
দুই ভাই মহাপণ্ডিত হিরণ্য-গোবর্দ্ধন।
হরিদাসের গুণ সবে কহে পঞ্চমুখে,
শুনিয়া সে দুই ভাই ডুবিল বড় সুখে।"

ঠাকুর হরিদাস যে প্রতিনিয়ত প্রতিদিন তিন লক্ষ নাম-কীর্ত্তন করিতেন, ইহা ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরাও অবগত ছিলেন। তাঁহারা এই হেতু, হরিনামের মহিমাপ্রসঙ্গেই, সকলে প্রফুল্ল-

হৃদয়ে আলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন। কেহ বলিলেন, হরিনাম গ্রহণে পাপ-ক্ষয় হয়, এবং কেহ কেহ বলিলেন যে, হরিনাম কীর্ত্তনই জীবের পক্ষে মোক্ষলাভের প্রধান পথ।

"তিন লক্ষ নাম ঠাকুর করেন কীর্ত্তন,
নামের মহিমা উঠাইল পণ্ডিতের গণ।
কেহ বলে নাম হ'তে হয় পাপ-ক্ষয়,
কেহ বলে নাম হ'তে জীবের মোক্ষ হয়।" (কৃ)

হরিদাস পণ্ডিতদিগের কোন কথাই অস্বীকার করিলেন না। কিন্তু তিনি এ সকল কথার উপরে ভক্তিধর্ম্মের সার-স্বরূপ একটি হৃদয়হারিণী অতিরিক্ত কথা কহিলেন। পাঠক জ্ঞাত আছেন যে, ব্রজ-বিহারী শ্রীকৃষ্ণই হরি-দাসের হৃদয়-বিহারী হরি। হরিদাস তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়াই সকলকে বুঝাইয়া বলিলেন যে, পাপ-ক্ষয় আর মুক্তি নাম-কীর্ত্তনের মুখ্য ফল নহে। মুখ্য ফল শ্রীকৃষ্ণের প্রেম লাভ। ভক্ত যখন ভগবানের ভাবে নিমগ্ন হইয়া, তাঁহার নাম-কীর্ত্তন করে, তখন পাপ আপনা হইতেই ক্ষয় পায়, মুক্তি আপনা হইতেই সংসিদ্ধ হয়। প্রকৃত ভক্ত তথাপি এ সকল আনুষঙ্গিক ফলের জন্য আকুল না হইয়া, ভক্তির স্বাভাবিক আকর্ষণে নাম-কীর্ত্তনে বিভোর রহে, এবং সর্ব্বদা আপনার প্রাণাধিক ধনের ঐরূপ নাম-কীর্ত্তন করিয়া, প্রেম-রসে আর্দ্র হইতে থাকে।

"হরিদাস কহে নামের এ দুই ফল নহে,
নামের ফলে কৃষ্ণ-পদে প্রেম উপজয়ে।

আনুষঙ্গিক ফল নামের মুক্তি পাপ-নাশ,
তাহার দৃষ্টান্ত যৈছে সূর্য্যের প্রকাশ।" (ক্র)

হরিদাস তাঁহার হৃদয়ের কথা ভাল করিয়া বুঝাইবার জন্য ভাগবত ও বৃহন্নারদীয় প্রভৃতি বিবিধ পুরাণের বহু শ্লোক পাঠ করিলেন, এবং পরিশেষে, ভাগবতের প্রসিদ্ধ টীকাকার শ্রীধর স্বামীর একটি সুমধুর শ্লোক আবৃত্তি করিয়া, সকলকে অতি সুন্দর ও সরল ভাষায় তাহার ব্যাখ্যা শুনাইলেন। শ্লোকটি এই,—

"অংহঃ সংহরদখিলং
সকৃদুদয়াদেব সকললোকস্য,
তরণিরিব তিমিরজলধে-
র্জয়তি জগন্মঙ্গলহরের্নাম।"

অর্থাৎ,—অন্ধকারসাগরে সূর্য্যের ন্যায়, উদয়োন্মুখ অবস্থাতেই সকল লোকের সর্ব্বপ্রকার পাপহারী জগন্মঙ্গল হরির নাম জয়যুক্ত হউক।

হরিদাস কখনও আপনা হইতে পণ্ডিতের আসন গ্রহণ করিতেন না। তাঁহার ইচ্ছা যে, সেখানে যে সকল প্রধান পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ সভাস্থ সকলকে এই শ্লোকটির সারার্থ বুঝাইয়া বলেন। পণ্ডিতেরা পূর্ব্বে তাঁহাকে যোগ-মগ্ন মহাভক্ত জ্ঞানে মনের সহিত সম্মান করিয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহার অসামান্য পাণ্ডিত্য ও জ্ঞান-

গাম্ভীর্য্য দর্শনে সকলেই প্রীতি ও শ্রদ্ধায় অধিকতর অবনত। তাঁহারা শ্লোকের ব্যাখ্যা করিবার ভার গ্রহণ না করিয়া, হরিদাসের উপদেশ শুনিবার জন্যই ঔৎসুক্য দেখাইলেন। তখন হরিদাস ভাব-গদ্‌গদ কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন,—

"যেমন জগতে সূর্য্যের উদয়, তেমনই জীব-হৃদয়ে জগন্মঙ্গল হরিনামের উদয়। এ দুইয়ে একটুকু সাদৃশ্য আছে। সূর্য্য যখন আপনার জ্যোতিতে সম্পূর্ণরূপে সমুদিত হয়, জীব তখন ধর্ম্ম কর্ম্ম ও মঙ্গলের প্রকাশ দেখিয়া প্রফুল্ল রহে। কিন্তু পৃথিবীর অন্ধকার উদয়ের অপেক্ষা করে না। উহা উদয়ের আরম্ভ সময়েই আপনা আপনি ক্ষয় পায়, এবং মনুষ্যের চিত্তে চোর, প্রেত, ও রাক্ষসাদির যে ভয় থাকে, তাহাও ঐ সময়েই বিনষ্ট হইয়া যায়। জীবের হৃদয়ে জগদীশ্বর হরির নামোদয়েও ঠিক এমনই অবস্থা ঘটিয়া থাকে। নামের যখন প্রকৃত উদয় হয়, তখন জীব প্রেমানন্দে আত্মবিস্মৃত রহে। কিন্তু জীবের আত্মায় যত কিছু পাপ ও তাপ থাকে, তাহার কিছুই উদয়ের অপেক্ষা করে না, সমস্তই নামাভাস অর্থাৎ নামোদয়ের আরম্ভ সময়েই সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়। ভগবান্ দিতে চাহিলেও, ভক্ত যে মুক্তির জন্য লালায়িত হয় না ইহাই তাহার কারণ। কেন না, মুক্তি অর্থাৎ পাপের বিনাশ নামের আভাস সময়েই সংসিদ্ধ হয়। যথা, চরিতামৃতে,—

"হরিদাস কহে যৈছে সূর্য্যের উদয়,
উদয় না হৈতে আরম্ভ তমো হয় ক্ষয়।
চৌর প্রেত রাক্ষসাদির ভয় হয় নাশ,
উদয় হৈলে ধর্ম্ম-কর্ম্ম-মঙ্গল প্রকাশ।
ঐছে নামোদয়ারম্ভে পাপ আদি ক্ষয়,
উদয় হৈলে কৃষ্ণপদে হয় প্রেমোদয়।
মুক্তি তুচ্ছ ফল হয় নামাভাস হৈতে,
যে মুক্তি ভক্ত না লয় কৃষ্ণ চাহে দিতে।"

সভায় তখন লোকের খুব ভিড়। হরিদাসকে দেখিবার জন্য, বহু লোক সে সভায় উপস্থিত ছিল। তাহারা সকলেই শ্লোকের ঐ রূপ শ্রুতি-মধুর ও প্রাণ-স্পর্শি ব্যাখ্যা শুনিয়া মোহিত হইল। পণ্ডিতেরা তাঁহাকে সুপণ্ডিত জ্ঞানে প্রশংসা করিলেন। সাধারণ লোকেরা, তাঁহার প্রগাঢ় প্রেমভক্তির পরিচয় পাইয়া, শতমুখে তাঁহাকে সাধুবাদ দিল। কিন্তু, ইহা একটি লোকের ভাল লাগিল না।

ঐ সভায় সে সময়ে গোপাল চক্রবর্ত্তী নামক হরিনদী গ্রামের একটি চপলচরিত্র ব্রাহ্মণযুবা উপস্থিত ছিল। সে লেখাপড়ায় পণ্ডিত ছিল বটে, কিন্তু কাজ করিত আরিন্দার। হিরণ্য-গোবর্দ্ধন যখন গৌড়েশ্বরের নিকট রাজস্ব পাঠাইতেন, গোপাল তখন সঙ্গে সঙ্গে যাইত, এবং টাকার বুঝ দেওয়া প্রভৃতি বিবিধ কার্য্য উপলক্ষে অনেক সময়েই গৌড়ে বাদ্‌শাহের দরবারে অবস্থান করিবার অধিকার পাইত।

"গোপাল চক্রবর্ত্তী নাম এক জন,
মজুমদারের ঘরে সেই আরিন্দা ব্রাহ্মণ।
গৌড়ে রহে, পাতশাহ আগে আরিন্দাগিরী করে,
বার লক্ষ মুদ্রা সেই পাতশাহারে ভরে।" (কৃ)

গৌড় রাজধানী। সুতরাং গৌড়ে অবস্থানই তখন, অনেকের কাছে, অভিমানের পরিচায়ক। তার উপর আবার সাক্ষাৎসম্বন্ধে গৌড়েশ্বরের দরবারে থাকিবার অধিকার! গোপাল এ গৌরবে সর্ব্বদাই গায়ে ফুলিয়া রহিত, এবং তাহার যখন যাহা মুখে আসিত, তাহাই সে নিঃসঙ্কোচে ও নির্ভয়ে কহিয়া ফেলিত। গোপালের একটু রূপও ছিল বটে, এবং সে আরিন্দা হইবার আগে কিছু কাল পণ্ডিতের টোলে ব্যাকরণ ও দর্শন-শাস্ত্র অভ্যাস করিয়াছিল। সে, এ সকল কারণে, কোন মনুষ্যকেই মনুষ্য বলিয়া গণনা করিত না। সভাস্থ সকল লোকেই যখন হরিনামের মহিমা শুনিয়া প্রীতি ও ভক্তি প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তখন গোপালের তাহা অসহ্য বোধ হইল। গোপালের খুব বেশী ক্রোধ জন্মিল। সে পণ্ডিতদিগকে হরিদাসের মতাবলম্বী দেখিয়া নানারূপ পরিহাস করিল, এবং হরিদাসকেও ভাবুক বলিয়া শ্লেষ ও বিদ্রূপ করিতে লাগিল। গোপাল কহিল,—"কোটি জন্মের ব্রহ্মজ্ঞানেও যে মুক্তি লাভ করা অসম্ভব হয়, জীব কি তাহা হরিনামের 'আভাস' মাত্রেই অনায়াসে লাভ করিতে পারে?"

"পরম সুন্দর, পণ্ডিত নূতন যৌবন,
নামাভাসে মুক্তি শুনি না হইল সহন।
ক্রুদ্ধ হৈয়ে বলে সেই সরোষ বচন,
ভাবুকের সিদ্ধান্ত শুন পণ্ডিতের গণ!
কোটি জন্মে ব্রহ্মজ্ঞানে যে মুক্তি না পায়,
এই কহে নামাভাসে সেই মুক্তি হয়।" (কৃ)

হরিদাস কহিলেন, ভাই তুমি বৃথা কেন সংশয় কর, আমি যাহা কহিয়াছি ইহাই প্রকৃত শাস্ত্র। শাস্ত্রের সার-সিদ্ধান্ত এই যে, হরিনামের আভাস মাত্রেই জীবের মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু ভক্তেরা তথাপি ভক্তি-সুখের তুলনায় মুক্তিকে অতি তুচ্ছ বস্তু জ্ঞান করেন। তাঁহারা এই নিমিত্ত কখনও মুক্তির জন্য প্রার্থী হন না।

"হরিদাস কহে কেন করহ সংশয়।
শাস্ত্রে কহে নামাভাস-মাত্র মুক্তি হয়।
ভক্তি-সুখ আগে মুক্তি অতি তুচ্ছ হয়,
অতএব ভক্তগণ মুক্তি না ইচ্ছয়।" (কৃ)

কিন্তু হরিদাসের এ বিনীত নিবেদন গোপালের হৃদয়ে পঁহুছিল না, এ বিনীত ব্যবহার গোপালকে দ্রব করিতে সমর্থ হইল না। গোপাল, হরিদাসকে কটু বলিল, হরিদাসের প্রতি যত দূর সম্ভব অশ্রদ্ধা ও অসম্মানের ভাব দেখাইল, এবং পরিশেষে চিত্তের অতৃপ্ত ক্রোধে, নানারূপ তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া সেই তপোরত মহাভক্তকে নিতান্ত নিকৃষ্ট

ভাষায় গালি দিল। হরিদাস আর একটি কথাও কহিতেছেন না, কিন্তু গোপালের মুখে গালিবোধক কদর্য্য শব্দের তরঙ্গ ছুটিল।

কবিবর বৃন্দাবনদাসও গোপাল কর্ত্তৃক ঠাকুর হরিদাসের এ অসম্মাননার বিবরণ সবিস্তরে বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু, তদীয় বর্ণনার সহিত চরিতামৃতের বর্ণনায় সামান্য কিছু পার্থক্য থাকিলেও উভয় লেখাই ভক্ত ও ভক্তির পরীক্ষার প্রমাণ। বৃন্দাবনদাস এ কাহিনীটিরে যে রূপে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহার প্রায় সমস্ত অংশই এ স্থলে পাঠকের পরিতৃপ্তির জন্য উদ্ধৃত হইল।

"হরিনদী গ্রামে এক ব্রাহ্মণ দুর্জ্জন,
হরিদাসে দেখি ক্রোধে বলয়ে বচন।
ওহে হরিদাস একি ব্যভার তোমার,
ডাকিয়া যে নাম লহ কি হেতু ইহার।
মনে মনে জপিবা এই সে ধর্ম্ম হয়,
ডাকিয়া লইতে নাম কোন্ শাস্ত্রে কয়।
কার শিক্ষা হরিনাম ডাকিয়া লইতে,
এইত পণ্ডিত সভা বলহ ইহাতে।
হরিদাস বলেন ইহার যত তত্ত্ব,
তোমরা সে জান হরিনামের মাহাত্ম্য।
তোমরা সবার মুখে শুনিয়া সে আমি,
বলিতে কি বলিবাঙ যেবা কিছু জানি।

উচ্চ করি লইলে শত গুণ পুণ্য হয়,
দোষ ত না কহে শাস্ত্রে গুণ সে বর্ণয়।
বিপ্র বলে উচ্চনাম করিলে উচ্চার,
শত গুণ ফল হয় কি হেতু ইহার।
হরিদাস বলেন শুনহ মহাশয়,
যে তত্ত্ব ইহার বেদে ভাগবতে কয়।
সর্ব্বশাস্ত্র স্ফুরে হরিদাসের শ্রীমুখে,
লাগিলা করিতে ব্যাখ্যা কৃষ্ণানন্দসুখে।
শুন বিপ্র সকৃৎ শুনিলে কৃষ্ণনাম,
পশু পক্ষী কীট যায় শ্রীবৈকুণ্ঠ ধাম।
পশু পক্ষী কীট আদি বলিতে না পারে,
শুনিলেই হরিনাম তারা সব তরে।
জপিলে সে কৃষ্ণনাম আপনি সে তরে,
উচ্চ সংকীর্ত্তনে পর-উপকার করে।
অতএব উচ্চ করি কীর্ত্তন করিলে,
শতগুণ ফল হয় সর্ব্বশাস্ত্রে বলে।
জপ-কর্ত্তা হৈতে উচ্চ সংকীর্ত্তনকারী,
শতগুণাধিক ফল পুরাণেতে ধরি।
শুন বিপ্র মন দিয়া ইহার কারণ,
জপি আপনারে সবে করয়ে পোষণ।
উচ্চ করি করিলে গোবিন্দ সংকীর্ত্তন,
শব্দ শুনিয়া পায় বিমোচন।

জিহ্বা পাইয়াও নর বিনে সর্ব্বপ্রাণী,
না পারে বলিতে কৃষ্ণনাম হেন ধ্বনি।
ব্যর্থজন্মা তাহারা নিস্তরে যাহা হৈতে,
বল দেখি কোন্ দোষ সে কর্ম্ম করিতে।
কেহ আপনারে মাত্র করয়ে পোষণ,
কেহ বা পোষণ করে সহস্রেক জন।
দুইতে কে বড় ভাবি বুঝহ আপনে,
এই অভিপ্রায় গুণ উচ্চ সংকীর্ত্তনে।
সেই বিপ্র শুনি হরিদাসের কথন,
বলিতে লাগিল ক্রোধে মহা দুর্ব্বচন।
দরশন-কর্ত্তা এবে হৈল হরিদাস,
কালে কালে বেদ পথ হয় দেখি নাশ।
যুগ-শেষে শূদ্রে বেদ করিবে বাখানে,
এখনই তাহা দেখি শেষে আর কেনে।
এই রূপে আপনারে প্রকট করিয়া,
ঘরে ঘরে ভাল ভোগ খাইস্ বুলিয়া।
যে ব্যাখ্যা করিলি তুই এ যদি না লাগে,
তবে তোর নাক কান কাটি পুনঃ আগে।
শুনি বিপ্রাধমের বচন হরিদাস,
হরি বলি ঈষৎ হইল কিছু হাস।
প্রত্যুত্তর আর কিছু তারে না করিয়া,
চলিলেন উচ্চ করি কীর্ত্তন গাইয়া।

গোপালের এই রূপ সংস্কার ছিল যে, সে গৌড়েশ্বরের অনুগৃহীত ব্যক্তি, হিরণ্য-গোবর্দ্ধনের আশ্রিত; সুতরাং সে সপ্তগ্রামের সভায় বসিয়া যাহা কিছু করিবে, তাহাই শোভা পাইবে। কিন্তু ফল ফলিল—বিপরীত। গোপালের ব্যবহার দেখিয়া সভাস্থ সমস্ত ভদ্রলোকই তাহাকে নানারূপ তিরস্কার করিলেন, পুরোহিত বলরাম আচার্য্য তাহাকে ঘট-পট-শাস্ত্রজ্ঞ তার্কিক মূর্খ বলিয়া গালি দিলেন, এবং মজুমদারেরা তাহাকে সভা হইতে উঠাইয়া দিয়া, যেন জগতে ভক্তির জয়খ্যাপনের উদ্দেশ্যে, ঠাকুর হরিদাসের পায়ে গড়াইয়া পড়িলেন।—

"শুনি সভাসদ্ উঠে করি হাহাকার,
মজুমদার সেই বিপ্রে করিল ধিক্কার।
বলাই পুরোহিত তারে করিল ভর্ৎসন,
ঘট-পটিয়া মূর্খ তুই মুক্তি কাহা জান?
হরিদাস ঠাকুরে তুই কৈলি অপমান,
সর্ব্বনাশ হবে তোর না হবে কল্যাণ।
শুনি হরিদাস তবে উঠিয়া চলিলা,
মজুমদার সেই বিপ্রে ত্যাগ করিলা,
সভা সহিত হরিদাসের চরণে পড়িলা।" (চৈ: চ:)

তখন হরিদাস সভাস্থ সমস্ত ব্যক্তিকে মৃদু হাস্য ও মধুর কথায় আশ্বস্ত করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন,—"তোমরা

সকলে দুঃখিত হইতেছ কেন? তোমাদিগের ত কোন বিষয়েই কোন দোষ নাই। আর এই ব্রাহ্মণেরও আমি কোন দোষ দেখিতেছি না। কারণ, এ ব্যক্তি একে অজ্ঞ, তাহাতে আবার তর্কপ্রিয়। যাহারা শুধু তর্কের দ্বারাই সকল তত্ত্ব পরিগ্রহ করিতে চাহে, তাহারা কি রূপে নামের মহিমা বুঝিতে পাইবে?

"তোমা সবার দোষ নাহি, এই অজ্ঞ ব্রাহ্মণ,
তার দোষ নাহি তার তর্কনিষ্ঠ মন।
তর্কের গোচর নহে নামের মহত্ত্ব,
কোথা হৈতে জানিবে সে এই সব তত্ত্ব।" (কৃ)

হরিদাস পুনরপি বলিলেন,—

"যাও ঘর, কৃষ্ণ করুন কুশল সবার,
আমার সম্বন্ধে দুঃখ না হউক কাহার।" (কৃ)

হরিদাস আশীর্ব্বাদের প্রত্যক্ষ বিগ্রহস্বরূপ ছিলেন। তিনি শত্রু মিত্র সকলকেই আশীর্ব্বাদ করিতে পারিতেন। ইহা পৃথিবীর অধিকাংশ লোকেই পারে না; হরিদাস পারিতেন। তাঁহার জন্য, এই হেতু, আজও অনেক লোকের প্রাণ কাঁদে, চক্ষে অশ্রু ঝরে।

হতভাগ্য গোপাল হরিদাস ঠাকুরের ক্ষমা লাভ করিল, কিন্তু হিরণ্য-গোবর্দ্ধন তাহাকে ক্ষমা করিলেন না। তাঁহারা তাহাকে নিতান্ত কঠোর ভর্ৎসনা করিয়া কর্ম্মচ্যুত করি-

লেন ; তার পর বাড়ি হইতে একবারে তাড়াইয়া দিলেন। কথিত আছে, গোপাল অচিরেই কুষ্ঠগ্রস্ত হইয়া বিপাকে পড়িয়াছিল, এবং সেই প্রদেশের সমস্ত লোকই তাঁহার অবস্থা আলোচনা করিয়া চমৎকৃত হইয়াছিল। যাহারা শত সহস্র লোকের ভক্তিভাজন ও গুরুস্থানীয় মহাজনদিগকে অসম্মান করিবার জন্য উৎসাহের সহিত অগ্রসর হয়, তাহাদিগের প্রকৃতি অবশ্যই বিকারগ্রস্ত ; এবং প্রবৃত্তির যে সকল বিকার কুষ্ঠরোগে পরিণত হইয়া থাকে, তাহা তাহাদিগের প্রকৃতিতে খুব বেশী থাকা অসম্ভব নহে।

হরিদাস সপ্তগ্রামের সভা হইতে বাহির হইয়া পুনরায় চাঁদপুরের কুটীরে লুক্কায়িত রহিলেন, এবং সেখানে কিছু-কাল বিশ্রামের পর, গঙ্গার তটে তটে শান্তিপুরের দিকে চলিয়া গেলেন। তিনি যখন বলরামের গৃহে অতিথি, তখন একটি ধীর, স্থির ও প্রখর-মেধাশালী বালকের সহিত প্রায় প্রতিদিনই তাঁহার সাক্ষাৎ হইত। বালকের মধুর মূর্ত্তি ও নম্র ব্যবহার তাঁহার হৃদয়কে বড় আকর্ষণ করিত। বালকের বয়স তখন নয় দশ বৎসরের অধিক নহে। কিন্তু সেই অল্প বয়সেই বালক সংস্কৃত ভাষায় একপ্রকার সুপ্রবিষ্ট, এবং ভক্তিশাস্ত্রের অর্থগ্রহ করিবার জন্য বৃদ্ধের ন্যায় উৎসুক।

বালকের নাম রঘুনাথ দাস। বালক গোবর্দ্ধন দাসের একমাত্র পুত্র এবং হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন এই উভয় ভ্রাতার

অতুল ঐশ্বর্য্যের একমাত্র উত্তরাধিকারী। সংসারে সুখ-সামগ্রীর সীমা নাই, তথাপি বালক বলরাম আচার্য্যের গৃহে অধ্যয়নের তৃষ্ণায় আত্মবিস্মৃত। এই বালকই কালে রঘুনাথ দাস-গোস্বামী নামে বঙ্গে, উৎকলে ও বৃন্দাবনধামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। ইঁহার রচিত স্তবাবলী নামক প্রসিদ্ধগ্রন্থ ভক্তিরসের একখানি উপাদেয় কাব্য, এবং ইঁহার জীবন, ভক্তির দীন-হীন দাস্যভাবে, নিখিল মানব-জগতে অদ্বিতীয়। ইনি জীবনের ত্যাগস্বীকারে জগদ্বিখ্যাত শাক্যসিংহেরও সন্নিধানে বসিবার যোগ্য পুরুষ, এবং বৈরাগ্যের চরমোৎকর্ষে ঋষি-যোগীরও শিক্ষাস্থল। হরিদাস এ সময়ে এক প্রকার বৃদ্ধ, রঘুনাথ বালক। বালকে ও বৃদ্ধে বিধিনির্ব্বন্ধে প্রগাঢ় প্রণয় জন্মিল। হরিদাসের ভক্তি, বৈরাগ্য ও বিষয়-বিতৃষ্ণা বালকের হৃদয়ে যাইয়া নব-জীবনে অঙ্কুরিত হইল।

"রঘুনাথ দাস বালক করেন অধ্যয়ন,
হরিদাস ঠাকুরে যাই করেন দর্শন।
হরিদাস কৃপা করে তাঁহার উপরে,
সেই কৃপা কারণ হৈল চৈতন্য পাইবারে।
তাহা যৈছে হরিদাসের মহিমা কথন,
ব্যাখ্যান অদ্ভুত কথা শুন ভক্তগণ!" (কৃ)

বলরাম আচার্য্য সমস্তই দেখিলেন, শুনিলেন, এবং বালকের প্রতি হরিদাসের কৃপা জন্মাইতে নানা কৌশলে

যত্ন করিলেন। কিন্তু সে কৃপা সাংসারিকতার পক্ষে কি রূপ কাল-সর্পের আকৃতিতে পরিণত হইয়া রহিল, বলরাম তখন তাহা বুঝিলেন না। পরে বুঝিয়াছিলেন বটে; সে পরের কথা পারি ত পরে বলিব।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

অদ্বৈত-সঙ্গ।

শান্তিপুরের কমলাক্ষশর্ম্মা নামক ভক্ত যুবা কি রূপে অদ্বৈত গোস্বামী নামে অভিহিত হন, তাহা অবশ্যই পাঠকের স্মরণে আছে। পাঠকের ইহাও মনে থাকা সম্ভব যে, অদ্বৈতের সহিত হরিদাস ঠাকুরের যখন নবদ্বীপের ভক্তি সভায় সাক্ষাৎকার হয়, তখন অদ্বৈত তাঁহাকে পূর্ব্বপরিচিত প্রিয়তম বন্ধু জ্ঞানে আদর করিয়াছিলেন। সে বন্ধুতা কি রূপে প্রথম সংঘটিত হয়, তাহা এতক্ষণ বলিবার সুযোগ পাই নাই; এই ক্ষণ বলিব।

কমলাক্ষ যখন মধ্বাচার্য্য সম্প্রদায়ের পঞ্চদশতম গুরু মহামতি মাধবেন্দ্র পুরীর নিকট কৃষ্ণনামে দীক্ষিত ও ভক্তির বিবিধতত্ত্বে শিক্ষিত হইয়া, বঙ্গে ভক্তিধর্ম্ম প্রচারের ভার গ্রহণ করেন, তখন তাঁহার বয়ঃক্রম সম্ভবতঃ ত্রিশ বৎসর। এক্ষণ সে কমলাক্ষ পঁয়ষট্টি বৎসর বয়স্ক পলিতকেশ বৃদ্ধ। কমলাক্ষ নাম ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বৎসরে একবারে লোপ পাইয়াছে। সে রূপ-লাবণ্যশালী তেজীয়ান্ যুবা, এক্ষণ বৃদ্ধ অদ্বৈত অথবা অদ্বৈত-আচার্য্য নামে, বহুসংখ্য বৈষ্ণব ভক্তের মধ্যে প্রভু-গোস্বামীর আসন পাইয়াছেন। তাঁহার এক টোল নবদ্বীপে, আর এক টোল শান্তিপুরে; এবং এই

উভয়ত্রই তাঁহার সমান প্রতিপত্তি,—উভয় স্থলেই, তাঁহার গৃহে অহোরাত্র ভক্তের সুখ-সমাগম।

অদ্বৈত হরিদাসের সবিশেষ জ্ঞাত হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহাকে চক্ষে দেখেন নাই। হরিদাসও, দূরে দূরে রহিয়াই, অদ্বৈতকে ভালরূপে জানিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার অবসর পান নাই। অথচ, দুইয়ের মধ্যে, বিনা পরিচয়েও, বিশিষ্ট পরিচয়, বিনা সন্দর্শনেও বিশিষ্ট প্রণয় ছিল। এরূপ অচাক্ষুষ প্রেম পৃথিবীর অনেক স্থলেই মনুষ্যের মধ্যে বড় বেশী আদরের বস্তু হইয়া পড়ে। পশু পশুরে চিনে ঘ্রাণে; মনুষ্য মনুষ্যকে চিনে আত্মার অলক্ষিত দৃষ্টিতে—প্রাণে প্রাণে। যাহারা এক পথের পথিক, এক ভাবের ভাবুক, এক রসের রসিক, তাহাদিগের পরস্পরের প্রাণের মধ্যে প্রীতির এইরূপ ফল্গুগঙ্গা সর্ব্বদাই প্রবাহিত হইয়া থাকে। লোকে দেখে না, অথচ প্রীতির অন্তঃসলিলা গঙ্গায় সর্ব্বদাই স্রোত বহে। যখন বিদ্যাপতির সহিত চণ্ডীদাসের প্রথম সাক্ষাৎ হয়, তখন উভয়েই উভয়কে দৃষ্টি মাত্র চিনিয়া লইয়াছিলেন। যখন হরিদাস শান্তিপুরের বাটীতে প্রথম উপস্থিত হইয়া অদ্বৈতপ্রভুর পাদবন্দনা করিলেন, অদ্বৈতও তখন দৃষ্টিমাত্রই তাঁহাকে হরিদাস বলিয়া চিনিতে পাইলেন, এবং তাঁহাকে বহুদিনের সুহৃদ্ জ্ঞানে আলিঙ্গন করিয়া আত্মায় শীতল হইলেন। উভয়ে উভয়ের

সন্দর্শনে, যেন ক্ষণমুহূর্ত্তেই শত বৎসরের সৌহার্দ্দসুখ হৃদয়ে সম্ভোগ করিয়া, একে অন্যের হৃদয়ে গাঁথা হইয়া রহিলেন।

অদ্বৈত সম্বদ্ধ গৃহস্থ, হরিদাস নিরাশ্রয় সন্ন্যাসী। অদ্বৈতের সংসার স্ত্রী-পুত্র-পরিজনের প্রমোদ-কোলাহলে পরিপূর্ণ, হরিদাসের এ সংসারে হরিনাম ভিন্ন আর কোন সম্বল নাই। তথাপি উভয়েরই এক মন, এক প্রাণ; এক ধর্ম্ম, এক ধ্যান। অদ্বৈতের ইচ্ছা, তিনি হরিদাসকে কিছু দিন সুখ-শান্তির প্রীতিকর উপচারে সন্তর্পণ করিয়া, আপনি একটু সুখী হন; এবং তাঁহার সঙ্গে,কৃষ্ণ-প্রেমের রসাস্বাদে সময় যাপন করেন। হরিদাসও, অদ্বৈতের মনের ভাব বুঝিয়া, কিছু দিন তাঁহার কাছে রহিতে সম্মত হইলেন। অদ্বৈত জানিতেন যে,তিন লক্ষ হরিনাম জপ না হইলে হরিদাসের অন্নজল গ্রহণ অসম্ভব। তিনি এই নিমিত্ত, গঙ্গার তটে, অতি নির্জ্জন প্রদেশে, হরিদাসকে একটি "গোফা" অর্থাৎ মৃণ্ময় কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন, এবং হরিদাস সে রমণীয় আশ্রমে ডুবিয়া রহিলেন। অদ্বৈত প্রতিদিনই একবার তাঁহাকে দেখিতে পাইতেন। হরিদাস যখন ভিক্ষার অনুরোধে অপরাহ্নে তাঁহার গৃহে আসিতেন, তখন সাক্ষাৎ হইত। অদ্বৈত তখন হরিদাসকে ভাগবত ও গীতার ভক্তিরসাত্মক অর্থ শুনাইতেন, * এবং উভয়ে

* ঈশান নাগর-প্রণীত অদ্বৈতপ্রকাশ নামক গ্রন্থে এ রূপ লিখিত আছে যে, ঠাকুর হরিদাস অদ্বৈতগোস্বামীর নিকটই সংস্কৃত ভাষায় ভক্তিধর্ম্মে

এক প্রাণে কৃষ্ণ-চরিত্রের রসাস্বাদনে সংসারের সকল সন্তাপ ভুলিয়া যাইতেন। যথা, চরিতামৃতে,—

"গঙ্গাতীরে গোফা করি নির্জ্জন তাঁরে দিল,
ভাগবত, গীতার ভক্তি অর্থ শুনাইল।
আচার্য্যের ঘরে নিত্য ভিক্ষা নির্ব্বাহন,
দুই জনে মিলি কৃষ্ণ-কথা আস্বাদন।"

সাধকেরা কি রূপ স্থানে আশ্রয় লইয়া ভগবানের প্রেমে চিত্ত সমাধান করিবেন, সে বিষয়ে প্রাচীন ঋষিদিগের বড় দৃষ্টি ছিল। ঋষিরা উপদেশ করিয়াছেন,—

**"সমে শুচৌ শর্করাবহ্নিবালুকা-
বিবর্জ্জিতে শব্দজলাশ্রয়াদিভিঃ
মনোনুকূলে ন তু চক্ষুপীড়নে
গুহানিবাতাশ্রয়ণে প্রযোজয়েৎ॥"**

অর্থাৎ,—যে সকল সমতল ও শুচিস্থান কঙ্করশূন্য, তপ্ত-বালুরহিত; যে খানে বিহঙ্গাদির সুমধুর শব্দ হৃদয় মন আকর্ষণ করে, জলের সুখ-শীতল দৃশ্য চক্ষুর প্রীতি জন্মায়, সমীরণ যেখানে ধীরে বহে, এবং যেখানে ধর্ম্মদ্বেষী বিরুদ্ধ-

---

সর্ব্ব প্রথম শিক্ষিত ও দীক্ষিত হইয়াছিলেন, এবং এ দেশে গুরুশিষ্যে যে সম্বন্ধ, অদ্বৈতের সহিত হরিদাসেরও সর্ব্বাংশে সেই সম্বন্ধ। এ কথা অপ্রামাণিক না হইতে পারে। কিন্তু চৈতন্য-ভাগবত ও চৈতন্য-চরিতামৃতের মত পরিচিত ও প্রামাণিক গ্রন্থের কোন স্থলেও এমন কোন কথার উল্লেখ নাই।

বাদীরা চিত্তের শান্তি নষ্ট করিবার জন্য উপস্থিত হইতে না পারে, সাধক তাদৃশ মনোরম নিভৃতপ্রদেশে নিবিষ্ট হইয়া নিখিল জগতের জীবনস্বরূপ জগদীশ্বরের ধ্যান করিবেন।

দরিদ্র হরিদাসও এ বিষয়ে ঋষিদিগের প্রদর্শিত পথই কতকটা অনুসরণ করিয়া ছিলেন। পৃথিবীর সর্ব্বপ্রকার সুখ-সামগ্রীর সহিত নির্লিপ্ত হইয়াও, তিনি তাঁহার সাধন-ভজনের স্থান নির্ব্বাচনে কবি-জন-স্পৃহণীয় কোমল রুচি ও রসগ্রাহিতার পরিচয় দিতেন। তাঁহার আশ্রম প্রায়শঃই লোকালয়ের অনতিদূরে প্রতিষ্ঠিত হইত। কেন না, লোক-জগতে হরিনাম প্রচারই তাঁহার জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল। কিন্তু, তাঁহার আশ্রম, এই এক কথা ছাড়া, আর সকল কথায়ই ঋষি-যোগীর আশ্রমের ন্যায় শোভা পাইত। কবি-রাজ-গোস্বামী তাঁহার গঙ্গাজল-ধৌত শান্তিপুরস্থ আশ্রমের নৈশ-শোভা কল্পনা করিয়া যে প্রকার বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা ভাবুক ও ভক্ত উভয়েরই হৃদয়হারী।

> "জ্যোৎস্নাবতী রাত্রি, দশ দিশা সুনির্ম্মল,
> গঙ্গার লহরী জ্যোৎস্নায় করে ঝল মল।
> দ্বারে তুলসী, লেপা পিণ্ডির উপর,
> গোফার শোভা দেখি লোকের জুড়ায় অন্তর।" (কৃ)

কিন্তু, হরিদাস শান্তিপুরের এ হেন আশ্রমেও দীর্ঘকাল রহিতে পারিলেন না। অদ্বৈত তাঁহাকে বড় বেশী আদর করিতেন। সে আদরের বোঝা তাঁহার সহ্য হইল না।

"হরিদাস কহে গোসাঞি করি নিবেদন,
মোরে প্রত্যহ অন্ন দেও কোন্ প্রয়োজন ?
মহা মহা বিপ্র এথা কুলীন সমাজ,
আমারে আদর কর না বাসহ লাজ।
অলৌলিক আচার তোমার কহিতে পাই ভয়,
সেই কৃপা করিবে যাতে তোমার রক্ষা হয়।"
"আচার্য্য কহেন তুমি না করহ ভয়,
সেই আচরিব যেই শাস্ত্রমত হয়।
তুমি খাইলে হয় কোটি ব্রাহ্মণ ভোজন,
এত বলি শ্রাদ্ধ পাত্র করাইল ভোজন।"

আগুন ঘৃতের প্রক্ষেপে দ্বিগুণ জ্বলে। অভিমানও সাধারণতঃ আদরের প্রক্ষেপেই ফুলিয়া উঠে। কিন্তু যে সকল মহাত্মার প্রকৃতিতে আগুনের জ্বালা অথবা অভিমানের অন্তর্দ্দাহ নাই, তাঁহারা আর এক শ্রেণির লোক। লোকে তাঁহাদিগকে সম্মান করিলে তাঁহারা স্ফীত না হইয়া নত হন, এবং পাছে সম্মানকারী সুহৃজ্জনের কোন রূপ বিপদ ঘটে, এই ভয়ে তাঁহারা জড় সড় রহেন। ঠাকুর হরিদাসও, অদ্বৈত-গোস্বামীর অত্যধিক সম্মাননায়, ভয়ে ও দৈন্যে একবারে জড় সড় হইয়া পড়িলেন, এবং পাছে অদ্বৈত তাঁহার সৌহার্দ্দ-সংস্পর্শে ঘুণাক্ষরেও স্ব-সমাজে বিড়ম্বিত হন, এই ভয়ে, শান্তিপুর ছাড়িয়া, ফুলিয়া গ্রামে আশ্রম করিলেন। কিন্তু হায়! তিনি কি ক্ষণে ফুলিয়ার অভিমুখে যাত্রা

করিলেন, তাহা তিনি কিংবা তাঁহার প্রাণের বান্ধব বিজ্ঞ অদ্বৈত মুহূর্ত্তের তরেও তখন চিন্তা করেন নাই। তাঁহার জীবনের যজ্ঞ কোথায় যাইয়া, কি ভাবে, পূর্ণাহুতি লাভ করিবে, তাহা তখন পর্য্যন্ত মুহূর্ত্তের তরেও, তাঁহার চিত্তপটে চিত্রিত হয় নাই। তিনি জানিতেন যে, সংসারের অনেক লোক, নিজ নিজ কর্ম্মদোষে, ভগবানের নাম-রসে বিমুখ কিংবা বিদ্বেষী হইয়া থাকে। কিন্তু, জীবের ঐ রূপ বিতৃষ্ণা ও বিদ্বেষ কি রূপ লোক-ভয়ঙ্কর দুষ্কৃতি ও দৌরাত্ম্যে পরিণত হইতে পারে, তাহা শত্রুমিত্রজ্ঞানশূন্য শিশু-চরিত্র হরিদাস স্বপ্নেও তখন পর্য্যন্ত পরিজ্ঞাত হন নাই।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

আনন্দ-প্রসঙ্গ।

শান্তিপুরের নিকটে, গঙ্গার তটে, এখনও ফুলিয়া নামে একটি গ্রাম আছে। ফুলিয়া, বাঙ্গালার ইতিহাসে, নানা কারণেই স্মরণ-যোগ্য ও সম্মানার্হ স্থান। যাঁহারা বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সমাজে অদ্যাপি "ফুলের মুখুটি" বলিয়া আদরের আসন প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, এই ফুলিয়াই তাঁহাদিগের সে কুল-গৌরবের পুরাতন ফুলিয়া। বঙ্গের চিরজীবী কবি কোমল-কণ্ঠ কৃত্তিবাস এই ফুলিয়ায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; এবং ঠাকুর হরিদাসও, শান্তিপুর পরিত্যাগের পর, এই ফুলিয়াতেই তাঁহার আসন করিয়া বঙ্গে হরিনাম প্রচার ও ভক্তি-ধর্ম্ম বিস্তারের জন্য যত্নপর হইয়াছিলেন।

ফুলিয়ায় বহুসংখ্য সরলহৃদয় ও শান্তস্বভাব নিরীহ ব্রাহ্মণের বসতি ছিল। হরিদাস যখন ফুলিয়ায় অবস্থিত হইলেন, তখন সেখানকার উক্তবিধ ব্রাহ্মণেরাই, তাঁহার অপূর্ব্ব প্রেম-ভক্তি দর্শনে, সকলের আগে তাঁহাতে আকৃষ্ট এবং হৃদয়ের অকপট বিশ্বাসে তাঁহার কাছে অবনত হইলেন। ভক্তির ভিখারী হরিদাস যে ইহাতে চিত্তে একটু বিশেষ উৎসাহ ও আনন্দ লাভ করিলেন, তাহার আর সন্দেহ কি?

"ফুলিয়া গ্রামের যত ব্রাহ্মণ সকল,
সবেই তাহানে দেখি হইলা বিহ্বল।

সবার তাহানে বড় জন্মিল বিশ্বাস,
ফুলিয়ায় রহিলেন প্রভু হরিদাস।"(বৃ)

হরিদাস অন্যান্য স্থানে নির্জ্জনে রহিয়া নিরন্তর নাম-জপ করিতেন; কিন্তু, ফুলিয়ায় কিছুকাল অবস্থানের পরই তিনি কীর্ত্তনের আনন্দে উন্মত্ত হইলেন। ভগবানের নাম-জপ যেমন ভক্তিশাস্ত্রে যজ্ঞ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে, নাম-কীর্ত্তনও সেই রূপ অতি পবিত্র ও প্রেমানন্দময় যজ্ঞ * বলিয়া বর্ণিত রহিয়াছে। কীর্ত্তনই ভাগবতের মতে ভক্তির মুখ্য সাধনা এবং ভক্তের মহাদুর্লভ ভোগ। হরিদাস ফুলিয়ায় থাকা কালে কিরূপ উন্মাদিত হৃদয়ে হরিনাম কীর্ত্তন করিতেন, কবিবর বৃন্দাবন দাস তাহার অতি সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন।

"নিরবধি হরিদাস গঙ্গা-তীরে তীরে,
ভ্রমেণ কৌতুকে কৃষ্ণ বলি উচ্চৈঃস্বরে।
বিষয় সুখেতে বিরক্তের অগ্রগণ্য,
কৃষ্ণ নামে পরিপূর্ণ শ্রীবদন ধন্য।
ক্ষণেক গোবিন্দ নামে নাহিক বিরক্তি,
ভক্তিরসে অনুক্ষণ হয় নানা মূর্ত্তি।

---

*"কলৌ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈ-
র্যজন্তি হি সুমেধসঃ।"
ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে।

কখন করেন নৃত্য আপনা আপনি,
কখন করেন মত্ত সিংহ প্রায় ধ্বনি।
কখন বা উচ্চৈঃস্বরে করেন রোদন,
অট্ট অট্ট মহা হাস্যে হাসেন কখন।
কখন গর্জ্জেন অতি হুঙ্কার করিয়া,
কখন মূর্চ্ছিত হই থাকেন পড়িয়া।
ক্ষণে অলৌকিক শব্দ বলেন ডাকিয়া,
ক্ষণে তাই বাখানেন উত্তম করিয়া।
অশ্রুপাত রোমহর্ষ হাস্য মূর্চ্ছা ঘর্ম্ম,
কৃষ্ণ-ভক্তি বিকারের যত আছে মর্ম্ম।
প্রভু হরিদাস মাত্র নৃত্যে প্রবেশিলে,
সকল আসিয়া তাঁর শ্রীবিগ্রহে মিলে।
হেন সে আনন্দ ধারা তিতে সর্ব্ব অঙ্গ,
অতি পাষণ্ডীও দেখি পায় মহারঙ্গ।
কিবা সে অদ্ভুত অঙ্গে শ্রীপুলকাবলি,
ব্রহ্মা শিব দেখিয়া হয়েন কুতূহলী।"

এ বর্ণনা ভাগবত-পুরাণ-প্রোক্ত একটি প্রসিদ্ধ শ্লোকের *

* এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ।

ভাবানুবাদ। ইহা কোন কোন অংশে অতি কল্পনা হইতে পারে। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানে, বহুসংখ্য প্রকৃত বৃত্তান্তের পরীক্ষা দ্বারাও, ইহা সপ্রমাণ হইয়াছে যে, মনুষ্যের হৃদয় যদি বিশেষ কোন ভাবের অতি প্রবল বিকাশে উদ্বেল হয়, তখন মানুষ একবার হাসে, একবার কাঁদে, একবার মূর্চ্ছিত হইয়া ধূলায় পড়ে, আবার আপনা হইতে মূর্চ্ছাভঙ্গে, কেমন এক আনন্দের আবেশে অধীর হইয়া নাচিতে আরম্ভ করে। ইয়ুরোপের অনেক কঙ্কর-কঠোর ক্রূর লোকও রাষ্ট্রবিপ্লবের উন্মত্ততায় এরূপ হাসিয়াছে ও কাঁদিয়াছে, এবং বাহ্যজ্ঞানশূন্য বিবশের ন্যায় নৃত্য করিয়াছে। যদি মানব-হৃদয় স্বজাতির জয়-পরাজয় অথবা স্বদেশবাৎসল্য প্রভৃতি পৃথিবীর কোন ক্ষণ-স্থায়ী ক্ষুদ্র ভাবেও এরূপ উন্মাদ-তরঙ্গে আন্দোলিত হইতে পারে, তাহা হইলে ভগবানের প্রতি প্রাণভরা ভক্তি, উহাতে নৃত্য মূর্চ্ছা অথবা অশ্রু পুলকাদির কতরূপ অচিন্তিত অবস্থায় পরিণত হইতে পারে, কে তাহার সীমা নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ হইবে?

ভক্তির এ সকল সাত্ত্বিক বিকারে, সুপণ্ডিত ও সদাশয় ব্যক্তিদিগেরও অনেক সময়ে সংশয় হইয়া থাকে। ফুলিয়ায়ও অনেক সুপণ্ডিত লোক প্রথমে একটুকু সংশয়াবিষ্ট না হইয়া ছিলেন, এমন নহে। কিন্তু তাঁহাদিগের সে সংশয় অচিরেই অপনীত হইল।

এরূপ সংশয়ের এক কারণ ভক্তিব্যবসায়িদিগের নট-নৈপুণ্য, আর এক কারণ ভগবানের প্রেম-স্বরূপে তাদৃশ সুপণ্ডিত সমালোচকদিগের অবিশ্বাস অথবা বিশ্বাসের অপূর্ণতা। ব্যবসায়ীর নট-লীলা বিষয়ে বেশী কিছু না বলিয়া, বিশ্বাসের অভাব সম্পর্কেই এখানে সামান্যতঃ দুই একটি কথা বলিব।

এই পুস্তকের কোন স্থলে পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, ভগবানের জন্য মনুষ্যের প্রাণে একটা অলক্ষিত আকর্ষণ থাকা সত্ত্বেও, কোন মনুষ্যই সহজে এবং শীঘ্র তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিতে পারে না। বিশ্বাসের ভাব, মনুষ্যের হৃদয়ে, আকাশের মেঘাবৃত জ্যোৎস্নার মত, এক বার একটুকু মিটি মিটি ফোটে, আবার সংশয়-রূপ মেঘের আড়ে লুক্কায়িত হয় এবং এই রূপ প্রকাশ, অপ্রকাশ অথবা অর্দ্ধপ্রকাশের অবস্থাতে মনুষ্যকে ধীরে ধীরে—যেন তাহার অজ্ঞাতসারে—ভগবানের অনন্ত মাধুর্য্যের দিকে টানিয়া লয়।

যদি বিশ্বাসের আলোক এইরূপ ক্রমবিকাশের নিয়মে বিকসিত না হইয়া, একবারে, এক সঙ্গে, একই মুহূর্ত্তে মানুষের হৃদয়ে ফুটিয়া পড়িত,—যদি মনুষ্যের চিত্তে ক্ষণকালের তরেও সত্য সত্যই এই রূপ অনুভূতি হইত যে, যিনি অনন্ত-কোটি সূর্য্য-চন্দ্রকে বিনা সূতার মালায় গাঁথিয়া বন-ফুলের মালার ন্যায় গলায় পরিয়াছেন, সেই বিশ্ব-মোহন ভগবান

অনন্ত দেব ঐ,—যাঁহার নাম মাত্র উচ্চারণেই জীবনের সকল দুঃখ, শান্তির সুখ-সিন্ধুতে ডুবিয়া যায়, জীবের সেই দুঃখ-হারী প্রাণ-বন্ধু ঐ,—যাঁহার করুণা-কণার স্পর্শমাত্রই জীবের পর্ব্বত-প্রমিত পাপ-রাশি প্রক্ষালিত হইয়া যায়, সেই পতিত-পাবন ভগবান্ হরি ঐ,—যিনি অনন্ত কাল হইতে অনন্ত কাল পর্য্যন্ত পিতা মাতা ও প্রাণারাধ্য প্রিয়তম রূপে সাথের সাথী, জীবের সেই প্রাণের ঠাকুর ঐ,—পুনরপি বলিতেছি, মনুষ্য যদি মুহূর্ত্তকালও এ মহার্থ সত্য আত্মায় অনুভব করিয়া জগজ্জীবন জগদীশ্বরকে তাহার সন্নিহিত বলিয়া বিশ্বাস করিত, তাহা হইলে সে তন্মুহূর্ত্তেই কি এক ভাবে অভিভূত হইয়া কি রূপ স্তম্ভিত দশা প্রাপ্ত হইত, বুদ্ধি তাহা চিন্তা করিয়া অবসন্ন হয়।

সুতরাং ইহা মানিয়া লইতে হইবে যে, ভগবানের প্রতি বিশ্বাসের অভাব, অথবা উল্লিখিতরূপ অপূর্ণ ও অস্ফুট বিশ্বাস, ভগবানেরই মঙ্গল্য বিধান, এবং এই অবস্থাই অধি-কাংশ মনুষ্যের প্রাথমিক শিক্ষাসোপান। অপিচ, ইহাও সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করিতে হইবে যে, যাঁহারা সাধু, সরল, সত্যবাদী এবং সাংসারিক লোকদিগের নিকট সুবোধ ও সুশিক্ষিত বলিয়া সম্মানিত, তাঁহারাও যে ভক্তির বিবিধ অদৃষ্টপূর্ব্ব ভাব ও উচ্ছৃঙ্খল অনুষ্ঠানকে অসত্য জ্ঞানে অবজ্ঞা করেন, ইহা কোন অংশেও অসম্ভব কিংবা অস্বাভাবিক

নহে। কেন না, যাঁহারা ভগবান্‌কেই সজীব সত্য জ্ঞানে বিশ্বাস করিতে সমর্থ হন নাই, তাঁহারা তাঁহারই মুখ-প্রেক্ষী, ভ্রমপ্রমাদের অধীন, সাধারণ একটি ভক্তকে কেমন করিয়া বিশ্বাস করিবেন ?

কিন্তু, প্রকৃত মধু যেমন মধুপ্রতিম শত প্রকার কৃত্রিম বস্তুর মধ্যে রহিয়াও স্বাদের প্রত্যক্ষ মাধুরীতে সমাদৃত হয়, মধুস্বভাবা প্রকৃত ভক্তিও উহার অভ্যন্তরীণ রস-মাধুর্য্যেই মনুষ্যের কাছে কালে সেই রূপ মিষ্ট অনুভূত হইয়া থাকে। যাঁহারা ফুলিয়া সমাজে সুপণ্ডিত, সুযোগ্য ও বুদ্ধিমান্ বলিয়া সাধারণের উপর চালক ও সমালোচকের মত ছিলেন, তাঁহা-রাও কালে ভক্ত হরিদাসকে যার পর নাই মিষ্ট বস্তু জ্ঞানে ভালবাসিতে লাগিলেন, এবং হরিদাস যখন ফুলিয়ায় ভক্তির জয়ধ্বনি শুনিয়া হরি হরি স্মরণে, অশ্রুজলে ভাসিলেন, তাঁহারাও তখন তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে হরিনাম কীর্ত্তন করিয়া অপরিসীম আনন্দ অনুভব করিলেন। শান্তিপুরের অদ্বৈত-গোস্বামীও সময়ের ইঙ্গিত বুঝিয়া গঙ্গার তটে হরিদাসের সহিত সম্মিলিত-হৃদয়ে নৃত্য গীত ও আনন্দ করিতে লাগি-লেন, এবং তাঁহারা উভয়ে মিলিয়া ফুলিয়া ও শান্তিপুরকে একই আনন্দে এক করিয়া তুলিলেন।

"পাইয়া তাঁহার সঙ্গ আচার্য্য গোসাঞি,
হুঙ্কার করেন আনন্দের অন্ত নাই।

হরিদাস ঠাকুর অদ্বৈত-দেব সঙ্গে,
ভাসেন গোবিন্দ-রস-সমুদ্র-তরঙ্গে।" (বৃ)

পুরাণশাস্ত্রে এ রূপ বর্ণনা আছে যে, ঋষিরা যখন যেখানে কোন রূপ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠানে ব্রতী হইতেন, রাক্ষস, অসুর ও পিশাচ প্রভৃতি নিকৃষ্ট জীবেরা তখনই সেখানে বিনা নিমন্ত্রণে উপস্থিত হইত, এবং আরব্ধ যজ্ঞের বিঘ্ন জন্মাইবার জন্য নানাবিধ উপদ্রব করিয়া, মনের আনন্দে খিল খিল করিয়া হাসিত। যজ্ঞের সুসমাপ্তি ও সাফল্য বিষয়ে তখনও বিঘ্ন বিপত্তির যে কথা, এখনও সেই কথা। কারণ, অসুর, রাক্ষস ও পিশাচ-প্রকৃতিক জীবেরা যজ্ঞমাত্রেরই চির-বিরোধী। মনুষ্য যদি লতাপাদপের ন্যায় নিশ্চেষ্ট অথবা পশুপক্ষীর ন্যায় আহার নিদ্রার সামান্য সুখেই নিতান্ত পরিতৃপ্ত রহিয়া "জীবন যাপন করে," তাহা হইলে জগতে কেহই তাহার বিরোধী হয় না। কিন্তু যখনই মনুষ্য আপনার জীবনকে ভক্তি, প্রীতি, দয়া অথবা সারস্বতী তৃষ্ণা প্রভৃতি কোন উচ্চ বৃত্তির উত্তেজনায় বিশেষ কোন যজ্ঞে পরিণত করিবার নিমিত্ত বুকের মধ্যে আগুন জ্বালে, পৃথিবীর অসুর ও রাক্ষসেরা সে অগ্নির ধূম-শিখা দর্শন করিয়া তখনই সেখানে যাইয়া আরক্ত চক্ষে দণ্ডায়মান হয়, এবং পিশাচেরাও সেখানে অন্ধকারে অঙ্গ ঢাকিয়া নানা কৌশলে বিঘ্ন জন্মাইয়া থাকে।

উদার-হৃদয় হরিদাস বেণাপোলের বনবাস-সময়ে এক প্রকার বিঘ্নের সম্মুখীন হইয়াছিলেন। সে বিঘ্নকে আসুরিক বলিতে পারি। কারণ, অসুরের ভোগ-লালসার সহিত তাহার সম্পর্ক ছিল। তিনি যদি সপ্তগ্রামের সভাস্থলে নাক-কান-কাটা কুৎসিত কথার ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে হৃদয়ে যন্ত্রণা পাইয়া থাকেন, সে যন্ত্রণার প্রবর্ত্তক সর্ব্বতোভাবেই একটা শক্তিসামর্থ্যশূন্য সাধারণ পিশাচ। তাঁহার সম্বন্ধে বাকী ছিল রাক্ষসের রক্ত পিপাসা। ফুলিয়া বাসের কিছু কাল পরে, সে রোম-হর্ষণ ও রুধির-শোষি পরীক্ষাও সন্নিহিত হইয়া আসিল;—তিনি প্রকৃতপ্রস্তাবে যজ্ঞে ব্রতী, না যাজকতার প্রলোভন-মুগ্ধ কপট-কুশল ক্রীড়ক মাত্র, বোধ হয়, এ কথার পরখের নিমিত্তই, যবন রাজপুরুষদিগের ঈর্ষ্যা ও বিদ্বেষ পরিশেষে বুভুক্ষু রাক্ষসের ভয়াবহ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া মুখ ব্যাদান করিল। অহো মনুষ্য! তুমিই দেবতা, তুমিই রাক্ষস! তুমি পৃথিবীর প্রত্যক্ষ স্বর্গ, তুমিই আবার ক্রমি-কীট-সঙ্কুল কুম্ভীপাক নরক! তুমিই উৎকর্ষে অমৃত, তুমিই অধঃপাতে বিষ! তুমিই সুরভি কুসুমকানন, তুমিই বিষ-সর্পের বাস-ভবন স্বরূপ ভয়ানক বন!

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

রাজ-দ্বারে ও কারাগারে।

যবনাধিকারের কিছু দিন পরেই, বঙ্গদেশের প্রায় সমস্ত সুপরিচিত স্থানে, কাজীর আসন সুপ্রতিষ্ঠিত। কাজীরা, শাসন-কার্য্যে কতকটা এখনকার মাজিষ্ট্রেটের মত, এবং বিচারে মুন্সেফদিগের ন্যায়, ক্ষমতা ভোগ করিতেন। কেহ কেহ আবার, স্থানে স্থানে, এই উভয় প্রকার ক্ষমতার উপর, গ্রামের দলাদলিতেও গায়ে পড়িয়া অধ্যক্ষতা করিতে যাইতেন।

দেশে কাজীর বিচারের বড় একটা বেশী সুখ্যাতি ছিল না। অনেক স্থলেই উহা প্রকৃত পরিহাসের বিষয় হইয়াছিল। কিন্তু তথাপি, আপদ বিপদে গাজীর ন্যায়, দেশীয়-দিগের দোষ-গুণের বিচারে কাজীই তখন সর্ব্বেশ্বর কর্ত্তা। কাজী যদি গাধার মুণ্ড ঘোড়ার কাঁধে চাপাইয়া দিয়া সেই বিচিত্র বস্তুকেই শ্বেতহস্তী নামে নির্দ্দেশ করিতেন, সকলে সেই নির্দ্দেশকেই শত শত সেলাম ও সাধুবাদের সহিত শিরোধার্য্য করিয়া লইত; এবং মনে যাহারই যাহা থাকুক, মুখে সকলেই কাজীর সেই সুক্ষ্ম বিচারের প্রশংসা করিয়া নিজ নিজ সম্মান রক্ষায় যত্নপর হইত। যাহারা একটুকু বুদ্ধিমান্, তাহারা আবার দেশের সাধারণ মূর্খদিগের নিকট উল্লিখিত বিচার ও ব্যবস্থার ভাষ্য ও ব্যাখ্যা করিয়া বেড়াইত।

জমিদারেরা, পাইকের প্রতাপে, কোথাও লাঠি মারিয়া, কোথাও বা ঘরে আগুন দিয়া, গৌড়ের রাজভাণ্ডারে রাজস্ব প্রেরণের কথা উপলক্ষে, প্রজার বুকের রক্ত শুষিতেন; এবং কাজী মহাশয়েরা, মফঃস্বলে রহিয়া, যবন রাজার প্রতিনিধি-রূপে, বিচারবিভাগের সকল বিষয়ের উপরই যথাসম্ভব দৃষ্টি রাখিতেন। জমিদারের পুত্র পৌত্রেরা যেমন প্রায় সকল স্থলেই পুরুষানুক্রমিক অধিকারে জমিদার হইতেন, কাজী-দিগের পুত্র পৌত্রেরাও, সাধারণতঃ সেই নিয়মেরই অনুবলে কাজীর পদে প্রতিষ্ঠিত রহিতেন।

ঠাকুর হরিদাসের পরিণত বয়সের সময়ে নবদ্বীপের কর্ত্তা চাঁদ কাজী, ফুলিয়া ও শান্তিপুরের কর্ত্তা গোড়াই কাজী। গোড়াই সেই শান্ত শিষ্ট ব্রাহ্মণসমাজের মধ্যে বৃহৎ একটি বৃশ্চিক বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তিনি তাঁহার বিচারের চক্ষে কাহাকেও ভাল বলিয়া জানিতেন না,—কাহারও ভাল দেখিতে পারিতেন না, এবং কেহ কোন অংশেও কোন রূপ সুখে আছে, এই মন্দ কথা কানে শুনিলেই, তাহাকে নিষ্ঠুর শাসন না করিয়া নিদ্রা লাভ করিতে সমর্থ হইতেন না।

হরিদাস যবনকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াও হিন্দু হইয়াছেন, গোড়াই এই কথা আলোচনা করিয়া হরিদাসের প্রতি পূর্ব্বা-পরই যার পর নাই ক্রুদ্ধ ছিলেন। গোড়াই যখন ইহার পর জানিতে পাইলেন যে, হরিদাস তাঁহার কাজীয়তের

কেন্দ্র-স্থান-স্বরূপ ফুলিয়ায় আসিয়া নির্ভয়ে স্থান করিতেছেন, এবং সেখানে অসংখ্য লোককে আগ্রহে হরিনাম শুনাইতেছেন, তখন তিনি ক্রোধে একবারে জ্বলিয়া উঠিলেন। তিনি কাজী। সুতরাং তিনি স্বয়ং হরিদাসকে কতকটা শাসন করিতে পারেন। কিন্তু তাদৃশ লঘু শাসনের কল্পনায় তাঁহার মন উঠিল না। তিনি ঐ নিশ্রয় ভক্তকে তাঁহার পাদ-তলে নিষ্পেষণ করিয়া মনেরসাধ মিটাইবার উদ্দেশ্যে, একবারে গৌড়ে চলিয়া গেলেন; এবং হরিদাসকে স্বধর্ম্মত্যাগী ও যবনধর্ম্মের মহাবিদ্রোহী বলিয়া তাঁহার নামে রাজদ্বারে রীতিমত অভিযোগ উপস্থিত করিলেন।

> "কাজী গিয়া মুলুকের অধিপতি স্থানে,
> কহিলেক সকল তাহান বিবরণে।
> গঙ্গাস্নান করি নিরবধি হরিনাম,
> উচ্চ করি লইয়া বুলেন সর্ব্বস্থান।
> যবন হইয়া করে হিন্দুর আচার।
> ভাল মতে তারে আনি করহ বিচার।" (বৃ)

তখন মুলুকের অধিপতি মহামহিম হুসেন শাহা। গৌড়ে তাঁহার রাজধানী। গৌড়ের পশ্চিম-রেখা-রূপিণী কালিন্দী গঙ্গার উভয় তটেই তাঁহার প্রাসাদ-মালা, এবং সমগ্র বঙ্গ-রাজ্যই তাঁহার করায়ত্ত। বঙ্গাধিপতি যবন ভূপতিরা দিল্লীশ্বরের অধীন রূপে রাজত্ব করিতেন। কিন্তু হুসেন শাহা,

সিংহাসন লাভের পরক্ষণ হইতেই, সর্ব্বতোভাবে স্বাধীন। তিনি সে সময়ে "সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহা শেরিফ মক্কা" এই নামে সুপরিচিত। বঙ্গের সর্ব্বত্রই লোকে তাঁহার নামে দোহাই দিত, এবং ধনী ও নির্ধন সকলেই তাঁহার শাসনে থর থর কাঁপিত। চট্টগ্রাম প্রদেশের প্রতিনিধি শাসনকর্ত্তা প্রসিদ্ধনামা ও পণ্ডিতপ্রিয় পরাগল খাঁ * তাঁহারই প্রধান সেনাপতি ছিলেন।

হুসেন শাহের সহিত বঙ্গীয় সিংহাসনের কোনরূপ পুরুষানুক্রমিক সম্পর্ক ছিল না। তাঁহার পূর্ব্ব নিবাস আরব দেশ। আরব দেশে যাহাদিগের অন্ন যুটিত না, এমন অনেক লোকই তখন অদৃষ্টপরীক্ষার আকাঙ্ক্ষায় ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ঘুরিয়া বেড়াইত। হুসেন শাহাও তাঁহার অদৃষ্টপরীক্ষার জন্যই বঙ্গে আসিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি বঙ্গে আসিয়া অদৃষ্টক্রমে একবারে বঙ্গেশ্বর হইয়া বসিলেন, এবং মহম্মদের সহিত বংশসম্পর্ক হেতু, এ দেশের মুসলমান-দিগের নিকট সৈয়দ উপাধিতে, সমধিক সম্মান লাভ করি-

* পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেনের প্রবন্ধাদিতেই পরাগল খাঁর বিবরণ পরিজ্ঞাত হইয়াছি। পরাগল খাঁর আদেশে বাঙ্গালায় এক-খানি মহাভারত সঙ্কলিত হইয়াছিল। তাহা চট্টগ্রাম প্রদেশে পরা-গলি মহাভারত বলিয়া পরিচিত।

লেন। তাঁহার পিতা কিংবা পিতামহ কিছু কাল মক্কায় শরিফের পদে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি সেই পরিচয়েও বিশেষ গৌরব পাইলেন। তিনি যখন পরিব্রাজকের বেশে বঙ্গদেশে প্রথম সমাগত, তখন গৌড়ের সিংহাসনে মুজঃফর শা। মুজঃফর শা, বাঙ্গালার ইতিহাসে, দুর্ব্বৃত্ত দস্যু বলিয়া বর্ণিত। সৈয়দ হুসেন, মুজঃফরের মনোরম প্রাসাদে, প্রিয় বয়স্য অথবা প্রধান মন্ত্রিরূপে, স্থান লাভ করিয়া, ক্রমে আপনার বুদ্ধিকৌশলে খুব বড় হইয়া উঠিলেন; এবং যখন সৈনিক, দৌবারিক,—প্রহরী, পদাতিক এবং সিংহাসন-পরিরক্ষক ও সহরের সমস্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিই তাঁহার কাছে বশতাপন্ন, তখন তিনি মুজঃফরের মর্ম্মভেদ ও মুণ্ডপাত করিয়া ১৪৯৮ খৃঃ অব্দে স্বয়ং রাজ-পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

এই সংক্ষিপ্ত পরিচয় হুসেন শাহার সুযশ অথবা সাধু-শীলতার পরিচয় নহে। কিন্তু ঐতিহাসিকেরা তথাপি তাঁহার যশঃকীর্ত্তন করেন, এবং তিনি বঙ্গদেশকে মুজঃফরের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার গুণ গান করিয়া থাকেন। ইহার এই তাৎপর্য্য যে, হুসেন শাহা, নিতান্ত মন্দ লোক হইলেও, তিনি এ দেশের যবন রাজা-দিগের মধ্যে মোটের উপর "মন্দের ভাল" ছিলেন। তাঁহার বুদ্ধি সকল সময়ে এক পথে চলিত না; এবং বুদ্ধির স্থিরতা ছিল না বলিয়া, তিনি সর্ব্বদা একই নীতির অনুসরণ করিতে

পারিতেন না। কিন্তু কোন কোন সময়ে তিনি দুই একটি ভাল কথা বলিয়া সদাশয় ব্যক্তিদিগেরও শ্রদ্ধাভাজন হইতেন; এবং কখনও বা আপনার বুদ্ধিতেই দুই একটি ভাল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া উন্নত চিত্তের পরিচয় দিতেন।

চরিতামৃত গ্রন্থেও হুসেন শাহার সামান্য একটুকু বিবরণ আছে। সে বিবরণের সহিত অন্যান্য ঐতিহাসিকদিগের লিখিত কোন কথারই সামঞ্জস্য নাই; কিন্তু, চরিত্রের চিত্রে একটুকু সাদৃশ্য আছে। চরিতামৃত পাঠেও ইহাই প্রতীতি জন্মে যে, হুসেন শাহা স্বভাবতঃ খুব বেশী নিষ্ঠুর অথবা লোক-পীড়ক ছিলেন না; অথচ, তাঁহার নিষ্ঠুর পরিজনেরা যখন তাঁহাকে পর-পীড়নে বুদ্ধি দিত, তখন তিনি সে বুদ্ধি অতিক্রম করিয়া চলিতে ভালবাসিতেন না।

চরিতামৃত-রচয়িতা কবিরাজ গোস্বামী হুসেন শাহার এক শত বৎসরের পরবর্ত্তী লোক। তিনি লিখিয়াছেন যে, হুসেন শাহার অল্প কিছু পূর্ব্বে, সুবুদ্ধি রায় নামে গৌড়ে এক জন হিন্দু রাজা ছিলেন; এবং হুসেন শাহা তাঁহার অধীন কর্ম্মচারিরূপে কার্য্য করিতেন। * রাজা হুসেনকে একটি

* কবিরাজ কৃষ্ণদাসগোস্বামী অতি সাবধান লেখক। তিনি তদীয় সুপ্রসিদ্ধ "চরিতামৃত" গ্রন্থে যে সকল ঐতিহাসিক বিবরণ সঙ্কলন করিয়াছেন, তাহার সর্ব্বত্রই বিশেষ সাবধানতার পরিচয় আছে। সুতরাং তাঁহার কোন কথাই উপেক্ষিত হইবার বিষয় নহে। কিন্তু

দীঘী কাটাইবার ভার দিয়াছিলেন। হুসেন শাহা সেই কার্য্যসম্পর্কে রাজার কাছে অপরাধী হন, এবং রাজা মনের ক্রোধ সংবরণ করিতে না পারিয়া তাঁহাকে চাবুক মারেন। যখন ইহার পর, অবস্থাচক্রের আবর্ত্তনে, রাজা সুবুদ্ধিরায় সিংহাসন-চ্যুত এবং হুসেন শাহা গৌড়ের সিংহাসনে অভি-ষিক্ত হইলেন, তখন হুসেন শাহা সেই চাবুকের দুঃখ বিস্মৃত হইয়াও সুবুদ্ধিরায়কে সুখ-সম্মানে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। হুসেন শাহার এ ব্যবহার তাঁহার স্ত্রীর নিকটে ভাল লাগিল না। তিনি হুসেনের অঙ্গে চাবুকের চিহ্ন দেখিয়া মর্ম্মে জ্বলিলেন, এবং এই হেতুই সুবুদ্ধিকে প্রাণে মারিবার জন্য জেদ করিলেন। কিন্তু, হুসেন শাহা তথাপি সুবুদ্ধিকে প্রাণে মারিতে পারিলেন না। তিনি করওয়ার

তিনি এই সুবুদ্ধিরায়ের কথা কোথায় পাইলেন, কোন প্রকারেই তাহার সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। ষ্টুয়ার্ট সাহেব বাঙ্গালার পুরাতন ইতিহাসে প্রামাণিক পণ্ডিত বলিয়া গণ্য। তাঁহার পুস্তকের কোন স্থলেও সুবুদ্ধিরায়ের নাম নাই, এবং অন্য কোন ঐতিহাসিক গ্রন্থের রাজনির্ঘণ্টেও সুবুদ্ধিরায়ের নাম পাওয়া যায় না। আমার ইহাতে এই বোধ হয় যে, সুবুদ্ধিরায় গৌড়ের নিকটবর্ত্তি কোন স্থলে, রাজা বলিয়া বিখ্যাত বড় একজন জমিদার ছিলেন, এবং সম্ভবতঃ হুসেন শাহা গৌড়েশ্বরের নিকট পরিচিত হইবার পূর্ব্বে তাঁহারই আশ্রয়ে জীবন যাপন করিয়াছিলেন।

জল দিয়া তাঁহার জাতিনাশ করাইলেন, এবং সুবুদ্ধিরায়ও সেই দুঃখে দেশ-ত্যাগ করিয়া বারাণসী চলিয়া গেলেন। যথা,—

"পূর্ব্বে যবে সুবুদ্ধিরায় ছিলা গৌড় অধিকারী,
সৈয়দ হুসেন খাঁ করে তাঁহার চাকরী।
দীঘাঁ খোদাইতে তাঁরে মনসীব কৈল,
ছিদ্র পাইয়া রায় তাঁরে চাবুক মারিল।
পাছে যবে হুসেন শাহা গৌড়ে রাজা হৈল,
সুবুদ্ধি রায়ের তিঁহ বহু বাড়াইল।
তাঁর স্ত্রী তাঁর অঙ্গে দেখি মারণের চিহ্নে,
সুবুদ্ধি রায়কে মারিতে কহে রাজা স্থানে।
রাজা কহে 'আমার পোষ্টা রায় হয় পিতা,
তাঁহারে মারিব আমি ভাল নহে কথা।'
স্ত্রী কহে 'জাতি লহ যদি প্রাণে না মারিবে,'
রাজা কহে 'জাতি নিলে ইঁহ নাহি জীবে।'
স্ত্রী মারিতে চাহে রাজা সঙ্কটে পড়িলা,
করওয়ার পানি তাঁর মুখে দেওয়াইলা।
তবে সুবুদ্ধি রায় সেই ছদ্ম পাইয়া,
বারাণসী আইলা সব বিষয় ছাড়িয়া।"

যাহা হউক, এখানে এক্ষণ সুবুদ্ধি রায়ের কথা লইয়া, তার বিশেষ আলোচনা না করিয়া, হুসেন শাহা এবং গোড়াই কাজীরই কথা কহিব। ফুলিয়ার গোড়াই কাজী সম্ভবতঃ

হুসেন শাহার এক জন প্রিয় পরিজন অথবা বিশ্বস্ত অনুজীবী ছিলেন। তিনি যখন গৌড়ের রাজদ্বারে হরিদাসের বিরুদ্ধে নানা রূপ কথা কহিয়া তর্জ্জন ও গর্জ্জন করিতে লাগিলেন, তখন হুসেন শাহাও হরিদাসের প্রতি রুষ্ট হইলেন, এবং তাঁহাকে ধরিয়া আনিবার জন্য হুকুম দিলেন।

"পাপীর বচন শুনি সেহ পাপ-মতি,
ধরিয়া আনিল তাঁরে অতি শীঘ্র গতি।" (বৃ)

হরিদাস যদি ধরা দিতে ইচ্ছুক না হইতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে ধরিয়া নেওয়া খুবই সহজ হইত, এমন নহে। বঙ্গদেশের হিরণ্যগোবর্দ্ধন অবধি হাড়ি ডোম চণ্ডাল পর্য্যন্ত অসংখ্য লোক তখন তাঁহাতে অনুরক্ত, এবং ফুলিয়া সমাজের সকলেই তাঁহার জন্য উন্মত্ত। সকলেই যখন জানিতে পাইল যে, গৌড়ে তাঁহার নামে অভিযোগ হইয়াছে, এবং গৌড়েশ্বর তাঁহাকে ধরিয়া নেওয়ার আদেশ করিয়াছেন, তখন ফুলিয়ার চারি ধারে একটা হাহাকার ধ্বনি উঠিল, এবং ঐ প্রদেশের মূর্খ ও পণ্ডিত সমস্ত লোকই গোড়াই কাজীকে মুক্তকণ্ঠে গালি দিতে লাগিল। গোড়াইর এত দিন একটা "ভরম্" ছিল। তাহা ভাঙ্গিয়া গেল। গোড়াইর নামে হাটে বাজারে ছি ছি এবং থু থু পড়িল। হরিদাস যদি পদলিপ্সু রাজ-নৈতিক অথবা বণিক্‌চরিত্র বিষয়ী হইতেন, তাহা হইলে তিনি এই সুযোগে অনায়াসেই কিছু করিয়া লইতে

পারিতেন। আর কিছু না হউক, অন্ততঃ গোড়াই কাজী-কেও একটুকু "আক্কেল" দিতে সমর্থ হইতেন। কিন্তু তাঁহাতে সে সকল ভাবের কিছুই ছিল না। তিনি এক দিকে যেমন নিষ্কাম ও নির্ব্বিকার, আর এক দিকে—এ ঘোরতর বিপত্তির সময়েও—তেমনই নিশ্চিন্ত ও নির্ভয়। তিনি গৌড়ের সংবাদ শুনিয়াই ধরা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হইলেন, এবং সুহৃদ্ স্বজনের আর্ত্তনাদের মধ্যেও আত্মার আনন্দে প্রফুল্ল রহিলেন।

যে সকল উচ্চশক্তিসম্পন্ন অসাধারণ মনুষ্য মানবজাতির ইতিহাসে কর্ম্মপুরুষ বলিয়া পূজা পাইয়া থাকেন, তাঁহারাও সাধারণতঃ নিশ্চিন্ত ও নির্ভয়চিত্ত। এই দুইটি গুণ বড়লোক মাত্রেরই অপরিহার্য্য ধর্ম্ম। কেন না, যাঁহারা রজ্জুদর্শনেই সর্প-ভয়ে অস্থির হন, তাঁহারা কখনও রাজ-নীতির রক্ত-গঙ্গায় সাঁতার দিতে পারেন না। আর, যাঁহারা মশকের দংশনে, অথবা মক্ষিকার শব্দ শ্রবণেই, বুদ্ধিভ্রষ্ট হইয়া হা হতোস্মি করিতে আরম্ভ করেন, তাঁহারাও কস্মিন্ কালে সংসারের কার্য্যক্ষেত্রে কাণ্ডারী হইয়া দাঁড়াইতে সাহস পান না। সুতরাং তাঁহারা, কর্ম্মের শাসনে এবং প্রয়োজনের তাড়নে, আপনা হইতেই কতকটা নিশ্চিন্ত ও নির্ভয়। কিন্তু তাঁহাদিগের সে ভাব, আর কাঙ্গাল হরিদাসের হৃদয়ের ভাব, কোন অংশেও তুলনায় আসিতে পারে না। তাঁহা-

দিগের নিশ্চিন্ত চিত্তে অভিমানের উত্তেজনাই প্রধান সম্বল এবং দৃক্‌পাতশূন্য নির্ভীকতার মধ্যেও আত্মনির্ভরের ভাবই সমধিক প্রবল। হরিদাসের প্রকৃতিতে এ দুইয়ের অণুমাত্র চিহ্নও পরিলক্ষিত হইত না। তিনি কখনও আপনাকে বড় লোক মনে করিতেন না, এবং কাহারও কাছে কোন প্রসঙ্গেই বড় লোকের বড় গলায় কথা কহিতে জানিতেন না। অথচ, দীন-হীন নিরাশ্রয় ভক্ত, আপনার প্রাণের মধ্যে, ভগবান্ দীনবন্ধুর পদাশ্রয় পাইলে, যে ভাবে নিশ্চিন্ত ও নির্ভয় হয়, হরিদাস সে অপার্থিব ভাবের অলৌকিক শক্তিতে লৌহস্তম্ভ হইতেও অধিকতর দৃঢ়, এবং পর্ব্বত হইতেও অধিকতর অটল ছিলেন। বস্তুতঃ, যাঁহারা এই পৃথিবীতে ভক্তির নির্ভরেই সম্পূর্ণরূপে নির্ভীক হইয়া মনুষ্য-প্রকৃতির উচ্চতর আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কে কোন্ অংশে হরিদাসের সমান, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। হরিদাসকে ধরিয়া নেওয়ার জন্য পাইক আসিল। হরিদাস পাইকদিগের কোন কথার প্রতীক্ষা কিংবা প্রতিবাদ না করিয়া প্রশান্তচিত্তে তাহাদিগের সঙ্গে চলিলেন, এবং যেখানে গৌড়ের বাদশাহ তাঁহার সভা মিলাইয়া বসিয়া আছেন, সেখানে যাইয়া নির্ভয়ে উপস্থিত হইলেন।

"কৃষ্ণের প্রসাদে হরিদাস মহাশয়,
যবনের কি দায় কালের নাহি ভয়।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া চলিলা সেই ক্ষণ,
মুলুকপতির আগে দিলা দরশন।" (বৃ)

এ দিন বাদশাহের সহিত হরিদাসের রীতিমত সাক্ষাৎ হইল না। এখন যেমন বিচারের আগে কারাগৃহে হাজত রাখার ব্যবস্থা আছে, তখনও ঐ প্রকার ব্যবস্থা ছিল। হরিদাস বঙ্গেশ্বরের কাছে আগমন মাত্রই কারাগৃহে বন্দী হইলেন। রক্ষকেরা তাঁহাকে কারাগৃহে লইয়া গেল। কারাগৃহে তখন অনেক হিন্দু বন্দী ছিল। বড় বড় জমিদারেরাও তখন উপযুক্ত সময়ে খাজানা দিতে না পারিলে কারাগৃহে বন্দী হইতেন। হরিদাসকে দেখিবার জন্য ঐ রূপ বন্দিদিগের মধ্যে ঔৎসুক্যের কোলাহল উঠিল। তাদৃশ মহাভক্ত ও পরম বৈষ্ণব, যবনের কোপ-নয়নে পড়িয়া, কারাগৃহে আসিয়াছেন, এ কথা মনে করিয়া অনেকেই প্রাণে কাঁদিল। অথচ এই সুযোগে তাঁহাকে দেখিতে পাইবে বলিয়া, সকলেই হর্ষবিষাদের অপূর্ব্ব উৎসাহে উতলা হইল। কেহ কেহ কারারক্ষকদিগকে কহিয়া বলিয়া দর্শন-পথের উপযুক্ত স্থানে যাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। যখন কিয়ৎক্ষণ পরে সে আনন্দস্নিগ্ধ ও উজ্জ্বল-কান্তি ভক্ত-সাধক কারাগৃহের মধ্য দিয়া চলিলেন, তখন তাঁহার পথের দুই পার্শ্বেই সকলে ভক্তির সহিত তাঁহাকে প্রণাম করিতে লাগিল।—

"হরিদাস ঠাকুরের শুনি আগমন,
হরিষে বিষাদ হৈল যত সুসজ্জন।
বড় বড় লোক যত আছে বন্দি-ঘরে,
তারা সব হৃষ্ট হৈলা শুনিয়া অন্তরে।
পরম বৈষ্ণব হরিদাস মহাশয়,
তানে দেখি বন্দি-দুঃখ পাইবেক ক্ষয়।
রক্ষক লোকেরে সবে সাধন করিয়া,
রহিলেন বন্দিগণ এক-দৃষ্ট হৈয়া।
আজানুলম্বিত ভুজ কমল-নয়ন,
সর্ব্ব মনোহর মুখ-চন্দ্র অনুপম।
ভক্তি করি সবে করিলেন নমস্কার,
সবার হইল কৃষ্ণভক্তির বিকার।" (বৃ)

হরিদাস কি রূপ প্রফুল্ল, প্রমোদপ্রিয় ও সদানন্দ পুরুষ, তাহা ঐ কারাগৃহে ক্ষণমুহূর্ত্তের মধ্যেই সকলের হৃদয়ঙ্গম হইল। বন্দীরা যখন হরিদাসের দর্শন লাভে, প্রবলতর হৃদয়-শক্তির স্বাভাবিক ক্রিয়ায়, কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর হইয়া, তাঁহার কাছে প্রণত হইল, তখন পরিহাসরসিক হরিদাস সকলকেই বাহু তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, এবং মৃদু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "তোমরা এখন এখানে যে ভাবে আছ, এ ভাবেই চিরকাল থাকিও।"

"তা সবার ভক্তি দেখি ঠাকুর হরিদাস,
বন্দী সব দেখিয়া পাইলা কৃপা হাস।

থাক থাক এখন আছহ যেন রূপে,
গুপ্ত আশীর্ব্বাদ করি হাসেন কৌতুকে।” (বৃ)

সকল রসেরই পৃথক্ পৃথক্ ভাষা আছে। সে পার্থক্য সাধারণের অনধিগম্য; অথচ যে যে রসের রসিক, তাহার জন্য সে রসের পৃথক্ ভাষা সকল সময়েই সুখ-বোধ্য। বন্দীরা, হরিদাসকে চক্ষে দেখিয়া, চিত্তে ক্ষণকাল একটুকু বিচলিত হইয়াছিল বটে। কিন্তু তাহারা সকলেই বিষয়ী। তাহারা আশীর্ব্বাদের মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া বড়ই বিষণ্ণ হইল। কোন কোন ব্যক্তি মুখ ফুটিয়া বলিল, “ঠাকুর! আপনি আমাদিগকে এ কি আশীর্ব্বাদ করিলেন? আপনার কি এই ইচ্ছা যে আমরা এ কারাগৃহে চিরজীবন এই ভাবে থাকিয়া দগ্ধ হই?”

তখন হরিদাস সকলকেই মিঠা কথায় আশ্বস্ত করিয়া বলিতে লাগিলেন, “ভাইরা শুন, আমি তোমাদিগের কাহাকেও মন্দ আশীর্ব্বাদ করি নাই। তোমরা একে আর বুঝিয়া মনে মনে দুঃখিত হইও না। আমি কৃষ্ণপ্রেমের কাঙ্গাল। কৃষ্ণ আমার প্রাণ। আমি সমস্ত জীবকেই কৃষ্ণের প্রেমে প্রীতি ও দয়ার চক্ষে দর্শন করিয়া থাকি। আমি কি সে মধুর নামে দীক্ষিত হইয়া কাহারও মন্দ কামনা করিতে পারি? আমি দেখিলাম, তোমাদের সকলেরই প্রাণ এক্ষণ কৃষ্ণপ্রেমে পরিপূর্ণ। জীবের ভাগ্যে এ ভাব

সকল সময়ে ঘটে না। তাই আমি হৃদয়ের সহিত তোমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ করিয়াছি যে, তোমরা এখন যে ভাবে আবিষ্ট আছ, এ ভাবেই চিরকাল আবিষ্ট থাকিও;—কৃষ্ণপ্রেমের অমৃতসাগরে চির-জীবন এই রূপ ডুবিয়া রহিও। ইহার অধিক আর এ সংসারে আশীর্ব্বাদ আছে কি? যাহারা কৃষ্ণপ্রেমে আকুল হইয়া প্রাণ ভরিয়া কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করে, পৃথিবীর কোন বিপদ অথবা কোন বন্ধনই কি তাহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে?"

কি বিচিত্র ভক্তি! কি বিস্ময়াবহ নির্ভরের ভাব! দুয়ারে সশস্ত্র প্রহরী, দরবারে মৃত্যুর করাল-জিহ্বা অথবা মৃত্যু হইতেও অধিকতর মর্ম্মভেদি যাতনা ও লাঞ্ছনার ভয়। ভক্তের প্রাণ এ অবস্থায়ও নিশ্চিন্ত, নির্ভয় এবং নামরসের সুধা-বিতরণে আনন্দময়। এরূপ ভক্তি যে প্রকৃতির তড়িন্ময়ী মহাশক্তির ন্যায় মুহূর্ত্তের মধ্যেই একটা প্রাণ হইতে শত শত প্রাণে ছড়াইয়া পড়ে, ইহা লৌকিক হইলেও অলৌকিক। হরিদাস যখন বন্দিদিগকে তাঁহার মনের কথা বুঝাইয়া বলিলেন, তখন তাহারাও মোটা মুটি এই বুঝিল যে, তাঁহাতে অলৌকিক শক্তির ছায়া আছে। নতুবা মনুষ্যের ভক্তি এত উপরে উঠিতে পারে না।

"না বুঝিয়া তাহান সে দুর্জ্ঞের বচন,
বন্দী সব হৈলা কিছু বিষাদিত মন।

তবে পাছে কৃপাযুক্ত হই হরিদাস,
গুপ্ত আশীর্ব্বাদ কহে করিয়া প্রকাশ।
আমি তোমা সবারে যে কৈল আশীর্ব্বাদ,
তার অর্থ না বুঝিয়া ভাবহ বিষাদ।
মন্দ আশীর্ব্বাদ আমি কথন না করি,
মন দিয়া সবে ইহা বুঝহ বিচারি।
এবে কৃষ্ণপ্রীতে তোমা সবাকার মন,
যেন আছে এই মত থাকুক সর্ব্বক্ষণ।

* * *

বন্দী থাক হেন আশীর্ব্বাদ নাহি করি,
বিষয় পাসর অহর্নিশ বল হরি।
ছলে করিলাম আমি এই আশীর্ব্বাদ,
তিলার্দ্ধেক না ভাবিহ তোমরা বিষাদ।
সর্ব্বজীব প্রতি দয়া দর্শন আমার,
কৃষ্ণে দৃঢ় ভক্তি হউক তোমার সবার।" (বৃ)

হরিদাসও বন্দিদিগের মুখচ্ছবিতে অকস্মাৎ ঐ রূপ মনঃ-ক্ষোভের লক্ষণ দেখিয়া চিত্তে বড় ক্লিষ্ট হইয়াছিলেন। যখন তাহারা সকলেই আবার তাঁহার সহিত আনন্দ করিতে লাগিল, তখন তিনি হৃদয়ে গাঢ় আনন্দ অনুভব করিলেন; এবং দর-বারের শঙ্কা ও কারাগারের দুঃখ উভয়ই তখন একেবারে বিস্মৃত হইয়া দয়াময় হরির নামরসে নিমগ্ন রহিলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

যবন রাজার বিচার ও জীবন-যজ্ঞের পূর্ণাহুতি।

রাত্রি প্রভাত হইল। যবনাধিপতি হুসেন শাহা দরবারে বসিলেন। চারিদিকে উজীর, নাজির, মোল্লা, মৌলবী, এবং দেশের বড় বড় কাজী ও মন্ত্রিবর্গ; মধ্যে হুসেন শাহা। গোড়াই কাজীও সেই দরবারে উপস্থিত।

আজি দরবারে লোকের বড় ভিড়। কেন না, দরবারে ঠাকুর হরিদাসের বিচার হইবে। এই শ্রেণির অপরাধী পৃথিবীর রাজ-দরবারে প্রায়শঃ বিচারার্থ আনীত হয় না। যখন হয়, তখন দেশের কাণা খোঁড়াও, সে বিচারের খবর লইবার জন্য, পাগলের মত ছুটিয়া বাহির হয়। হুসেন শাহা যখন দরবারে আসিয়া উপবিষ্ট হইলেন, তখন তিনি দেখিলেন যে, তাঁহার চারিদিকেই লোকে লোকারণ্য। তিনি সে নিস্তব্ধ লোকারণ্য দেখিয়া চিত্তে একটুকু চমকিত হইলেন। তিনি ইহা স্পষ্টই বুঝিলেন যে, তাঁহার বিচারের আসামী বঙ্গের একটা অসাধারণ লোক।

বঙ্গের পুরাতন রাজধানী গৌড়নগরী পাল রাজাদিগের প্রভুত্বকালে, বুদ্ধ-দেব-প্রচারিত অহিংসা ও পরোপকার ধর্ম্মের পবিত্র গাথা সকল শ্রবণ করিয়া, সময়ে সময়ে ভাবের গাম্ভীর্য্যে স্তম্ভিত হইয়াছে, এবং সেন রাজাদিগের আধিপত্য

সময়ে, হিন্দুসমাজের চিরপূজার্হ সাধুসজ্জন ও ভক্ত মহাজন-দিগের পদ-রেণু স্পর্শ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিয়াছে। আজি সেই গৌড়ই অহিংসা ও পরোপকার-ধর্ম্মের প্রত্যক্ষ প্রতিকৃতি এবং অসংখ্য হিন্দুর ভক্তিভাজন মহাভক্তকে যবন রাজার রাজদরবারে বিচারার্থ "বন্দী" দেখিয়া সেই দিকে তাকাইয়া রহিয়াছে। ইহার উপর আবার অবস্থার বৈচিত্র্য অথবা অদৃষ্টের বিড়ম্বনা কি হইতে পারে? মানুষের যেমন প্রাণ আছে, নগরেরও যদি সেই-রূপ একটা প্রাণ থাকিত, তাহা হইলে বোধ হয়, গৌড়ের সে বিষ-জর্জ্জরিত ও দুঃখ-দগ্ধ প্রাণটা আজি যবন রাজার এ বিচার অথবা অবিচারের আয়োজন দেখিয়াই শতধা বিদীর্ণ হইত, এবং উহার অন্তর্ভেদি করুণ-বিলাপ ও হাহা-কার শব্দে সমস্ত বঙ্গ থর থর কাঁপিত।

হুসেন শাহা প্রতীক্ষার ভাবে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে হরিদাস সে সভাস্থলে আনীত হইলেন, এবং উভয়েই ক্ষণ কাল উভয়ের দৃষ্টিতে আবদ্ধ রহিলেন। যবনাধিপতি হরিদাসের নাম শুনিয়াছিলেন, তাঁহাকে কখনও চক্ষে দেখেন নাই। তিনি যখন সেই কৃশ-তনু, কমনীয়কান্তি, কোমলদৃষ্টিসম্পন্ন, সমুজ্জ্বল ভক্তপুরুষকে সম্মুখে দেখিলেন, তখন তাঁহার মনে সহসা কেমন একটা নূতন ভাব জন্মিল। তিনি তখন যেন কি এক অনির্ব্বচনীয় আকর্ষণে, যেন কি

মোহে, কাজীর অভিযোগের কথা বিস্মৃত হইয়া হরিদাসের প্রতি যার পর নাই সম্ভ্রমের ভাব দেখাইলেন, এবং যদিও হরিদাস অপরাধী রূপে দণ্ডায়মান, তথাপি তাঁহাকে সভা-স্থলে গৌরবের আসন প্রদান করিলেন।

"বন্দী সকলের করি শুভানুসন্ধান,
আইলেন মুলুকের অধিপতি স্থান।
অতি মনোহর তেজ দেখিয়া তাহান,
পরম গৌরবে বসিবারে দিল স্থান।" (বৃ)

যবনাধিপতি হরিদাসকে প্রথমে প্রকৃতই একটুকু প্রীতি দেখাইলেন, এবং বহুদিনের পরিচিত পুরাতন সুহৃদের ন্যায় প্রীতি ও শ্রদ্ধার সহিত বলিলেন ;—

"ভাই, তোমার এ কি রূপ মতি গতি? মনুষ্য কত ভাগ্যে যবন হইয়া জন্ম লাভ করে। তুমি সেই যবনের কুলে জন্মলাভ করিয়াও হিন্দুর আচারে অনুরক্ত হইয়াছ; ইহা কেমন কথা? আমরা যেখানে হিন্দুর মুখ দেখি, সেখানে ভাত খাই না। আর তুমি যবনের 'মহাবংশজাত' হইয়াও 'জাতি-ধর্ম্ম' লঙ্ঘন করিতেছ,—যবন হইয়াও হিন্দুর অনা-চারে ডুবিতেছ। তোমার চিত্তে কি পাপভয়ও নাই? তুমি কি প্রকারে পরলোকে নিস্তার পাইবে? যাহা হউক, তুমি না বুঝিয়া এবং না জানিয়া যে সকল পাতক করিয়াছ, যদি তাহা হইতে পরিত্রাণ চাও, তাহা হইলে এখনই

পুনরায় কলমা পড়। নহিলে তোমার আর উদ্ধারের পথ নাই।”

“আপনে জিজ্ঞাসে তারে মুলুকের পতি,
কেন ভাই তোমার কি রূপ দেখি মতি।
কত ভাগ্যে দেখ তুমি হয়েছ যবন,
তবে কেন হিন্দুর আচারে দেহ মন।
আমরা হিন্দুরে দেখি নাহি খাই ভাত,
তাহা ছোড়, হই তুমি মহাবংশ-জাত।
জাতি-ধর্ম্ম লঙ্ঘি কর অন্য ব্যবহার,
পরলোকে কেমনে বা পাইবা নিস্তার।
না জানিয়া যে কিছু করিলা অনাচার,
সে পাপ ঘুচাহ করি কলিমা উচ্চার।” (বৃ)

যাহারা ভাগ্যবশতঃ ‘মুলুকের পতি’ হয়, তাহারা আর কিছু পারুক আর না পারুক, মানুষ লইয়া একটুকু খেলা খেলিতে পারে। ইহা তাহাদিগের অভ্যাস-সিদ্ধ এবং প্রভুত্বের অবশ্যম্ভাবি ফল। মুলুকের পতি * হুসেন শাহাও

* ঠাকুর হরিদাসের বিচার সময়ে এবং বিচার সম্পর্কে মুলুকের অধিপতি কে? বঙ্গদেশের কোন কোন বিশিষ্ট লেখক এরূপ অনুমান করিয়াছেন যে, মুলুকপতি নামে এক জন কাজী ছিল। হরিদাস অভিযুক্ত হইয়া তাহারই নিকট বিচারার্থ নীত হন, এবং উক্ত মুলুকপতি রীতিমত বিচার করিয়া তাঁহার দণ্ডবিধানের আজ্ঞা দেন, এ কথা আমার নিকট কোন ক্রমেই যুক্তি সঙ্গত জ্ঞান হয় না। (১)—এক কাজী আর এক কাজীর নিকট অভিযোগ করিবে কেন? (২)—যদি কাজীর

এ স্থলে একটুকু খেলা খেলিলেন। তিনি ইচ্ছা করিয়াই চতুরতার পথ লইলেন। তিনি হরিদাসের আকৃতি দেখিয়াই বুঝিয়াছিলেন যে, এ ব্যক্তি সাধারণ শ্রেণির লোক নহে। তাই তিনি আগে ভয় না দেখাইয়া শ্রদ্ধা ও সম্মা-

বিচারেই চরম দণ্ডের সম্ভাবনা থাকিবে, তাহা হইলে গোরাই কাজী নিজে বিচার করিল না কেন? তখনকার কাজী এখনকার একটি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের অতিরিক্ত ক্ষমতাযুক্ত মুন্সেফের পদে অভিষিক্ত ছিলেন। তাদৃশ এক সামান্য গ্রাম্য বিচারকের বসতিগ্রামে বাইশটা বাজার, বড় একটা কারাগার এবং সে কারাগারে অসংখ্য সম্ভ্রান্ত বন্দীর অবস্থান কি রূপে সম্ভবপর হয়?—পক্ষান্তরে, ঠাকুর বৃন্দাবন দাস, তদীয় ভাগবতে সে বিচারককে পুনঃপুনই মুলুকের পতি অথবা অধিপতি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কোথায় মুলুকের অধিপতি, আর কোথায় মুলুকপতি নামক কাজী এ দু-ই কি এক কথা? আমি এই সকল কারণে বিখ্যাত নামা হুসেন শাহকেই ঐ সময়ের গৌড়েশ্বর এবং হরিদাসের দণ্ড-বিধাতা অথবা মুলুকের অধিপতি বলিয়া অবধারণ করিয়াছি। আমার এই অবধারণ অবস্থানুসারে সুসঙ্গত হইয়াছে কি না, পাঠক তাহা বিচার করিবেন। কবিরাজ কৃষ্ণদাস গোস্বামীর গ্রন্থ পাঠে যাহা জানা যায় তাহাতেও ইহাই সিদ্ধান্ত হয় যে, সৈয়দ হুসেন শাহই ঐ সময়ে গৌড়ের রাজধানীতে বঙ্গেশ্বরের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। Stewart সাহেবের প্রণীত বঙ্গ দেশের ইতিহাস অনুসারে হুসেন শাহ ১৪৯৮ খৃঃ অব্দ হইতে ১৫২০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত অর্থাৎ ২৩ বৎসর কাল বঙ্গাধিপত্যে নিযুক্ত থাকেন। হরিদাসের জন্ম কাল ইদানীং ১৩৭২ শকাব্দ অর্থাৎ ১৪৫০ খৃঃ অব্দ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। যে সময়ে তিনি গৌড়ের বিচারে দণ্ডিত হন, সেই সময়ে সম্ভবতঃ তাঁহার বয়স ৫০ বৎসর। সুতরাং সকলদিকেই যখন কথার সুসঙ্গতি তখন আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় সৈয়দ আলাউদ্দিন হুসেন শাহই বৃন্দাবন-বিরচিত চৈতন্যভাগবতের মুলুকের অধিপতি।

ভাবে উপদেশ করিলেন। কিন্তু তাঁহার এই আদর ও দেশের প্রণালীতে কোন রূপ অভীষ্ট ফল ফলিল না। দাস হরিনামে আত্মহারা, কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর। তিনি তদিন যে নাম তিন লক্ষ বার জপ করিয়াও প্রাণের প্ত তৃষ্ণায় উন্মাদিত রহেন, এক্ষণ সুখ-সম্মানের প্রলো- ন সেই নাম পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় কলমা পড়িবেন, কি তাঁহার মত সিদ্ধ পুরুষের পক্ষেও সম্ভব হয়? রই নাম 'স্বধর্ম্মত্যাগ,'—ইহাই সংসারের নিকট সর্ব্বস্ব- র্জ্জন ও আত্ম-বিক্রয়। যাঁহারা এই জগতে হরি- সর আত্মা লইয়া জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারা কি কখনও ারের কোন রূপ প্ররোচনায়, আপনার আরাধনার ধনকে পক্ষা করিয়া এইরূপ আত্মাবমাননা স্বীকার করিতে র্থ হন?

হরিদাস এতক্ষণ, চিত্রিত-মূর্ত্তির ন্যায়, নীরব ও নিস্পন্দ বিষ্ট ছিলেন। যখন যবনাধিপতির উপদেশ বাক্য পরি- প্ত হইল, তখন তিনি যেন একটুকু আত্মবিস্মৃত ভাবে হো বিষ্ণুমায়া' এই বলিয়া একবার উচ্চৈঃস্বরে হাসিলেন।

"শুনি মায়ামোহিতের বাক্য হরিদাস,
অহো বিষ্ণুমায়া বলি হৈল মহা হাস!" (বৃ)

ঐরূপ সময়ে ঐ প্রকার হাসিতে প্রেমোন্মাদের ভাব র আর কিছুই পরিব্যক্ত হইতে পারে না। হরিদাসও

তখন প্রেমোন্মাদের অলৌকিক ভাবে পৃথিবীর সহিত সম্পর্ক-শূন্য। তিনি আগে ঐরূপ হাসিলেন। তার কিছুক্ষণ পরে যবনাধিপতিকে সম্বোধন করিয়া, বিনয়-মধুর গভীর-স্বরে, ধীরে ধীরে বলিলেন,—

"বাবা! আপনি রাজ্যের অধীশ্বর; আপনি দয়া করিয়া আমার কথায় প্রণিধান করুন। আপনি যাঁহাকে ঈশ্বর জ্ঞানে ভজনা করেন, আমিও তাঁহাকেই পূর্ণানন্দময় অদ্বি-তীয় ঈশ্বর বলিয়া আরাধনা করি। কোরানেও তাঁহারই কথা, পুরাণেও তাঁহারই তত্ত্ব; এবং তাঁহারই 'নাম মাত্র ভেদ' লইয়া হিন্দু ও যবনের সর্ব্বপ্রকার প্রভেদ। কিন্তু, তাঁহাকে যে কেন যে নামে ডাকুক না, তিনি সকলেরই সমান আরাধ্য,—সকলেরই ঈশ্বর। আমি তাঁহারই নাম কীর্ত্তন করিয়া অপরাধী হইলাম কিসে?"

বলিতে বলিতে হৃদয় খুলিল। হরিদাস পুনরপি বলিলেন,—

"এক শুদ্ধ নিত্য বস্তু অখণ্ড অব্যয়,
পরিপূর্ণ হয়ে বসে সবার হৃদয়।
সেই প্রভু যারে যেন লওয়ান মন,
সেই মত কর্ম্ম করে সকল ভুবন।
সে প্রভুর নাম গুণ সকল জগতে,
বলেন সকলে মাত্র নিজ শাস্ত্র মতে।" (বৃ)

হরিদাস এইরূপে তাঁহার উদার হৃদয়ের উদার ধর্ম্ম

সভাস্থলে সকলকেই বুঝাইয়া বলিলেন। যিনি তাঁহার
প্রাণের হরি, প্রাণাধিক কৃষ্ণ, প্রাণারাধ্য বিষ্ণু অথবা বিশ্বম্ভর
নারায়ণ, তিনিই যে জগন্ময় জগদীশ্বর,—জগতের সকল
দেশে, সকল কালে, সকল সম্প্রদায়স্থ উপাসকেরই প্রাণেশ্বর,
হরিদাস তাঁহার গভীরতম বিশ্বাসের এই মহাসত্য মনের
উচ্ছ্বলিত বেগে সভাস্থলে বিবৃত করিলেন। সভায় অসংখ্য
যবন এক দৃষ্টিতে উপবিষ্ট ছিল। তাহারা হরিদাসের কথা
শুনিয়া মোহিত হইল। যবনাধিপতি স্বয়ংও মুখচ্ছবির
প্রশান্ত ভাবের দ্বারা সন্তোষ প্রকাশ করিলেন।

সেখানে যত গুলি কাজী উপবিষ্ট ছিল, তাহার মধ্যে
এক জনই নিতান্ত দুষ্ট বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এই ব্যক্তিই
মুলিয়ার গোড়াই কাজী। সে যখন দেখিল যে, জালের দড়ি
ছিঁড়িয়া যাইতেছে,—তাহার বাগুরাবদ্ধ বিহঙ্গ হরিনাম লইয়া
উড়িয়া যাইবার পথ পাইতেছে, তখন সে যবন রাজার নিকট
করজোড়ে অথচ উচ্চৈঃস্বরে দোহাই দিয়া বলিতে লাগিল,
"বিচারপতি! এই ব্যক্তির প্রতি আপনি সুবিচার ও সমুচিত
শাস্তির বিধান করুন। হয় এই ব্যক্তি হিন্দুর শাস্ত্র পরিত্যাগ
করিয়া পুনরায় আপনার জাতি-শাস্ত্রের আশ্রয় লউক, না হয়
উপযুক্ত শাস্তি ভোগ করুক। যদি এই দুইয়ের একও না
হয়, তাহা হইলে জগতে যবন-ধর্ম্ম ও যবন-জাতির বড়ই
কলঙ্ক রটিবে,—যবনের সমস্ত মহিমা বিলুপ্ত হইবে।"

"হরিদাস ঠাকুরের সুসত্য বচন,
শুনিয়া সন্তোষ হৈল সকল যবন।
সবে এক পাপী কাজী মুলুক-পতিরে,
বলিতে লাগিলা শাস্তি করহ ইহারে।
এই দুষ্ট আর দুষ্ট করিব অনেক,
যবন কুলে অমহিমা আনিবেক।
এতেকে ইহার শাস্তি কর ভাল মতে,
নহে বা আপন শাস্ত্র বলুক মুখেতে।" (বৃ)

পূর্ব্বেই ইহা আভাসে জানাইয়াছি যে, হুসেন শাহা বড় দুর্ব্বল প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি হরিদাসের কথায় যেমন একটুকু দ্রব হইতেছিলেন, গোড়াই কাজীর কঠোর উক্তিতে তেমনই আবার কঠোর মূর্ত্তি ধারণ করিলেন; এবং এইবার একটুকু কটু বলিলেন ও কটুকণ্ঠে ভয় দেখাইলেন।—

"পুন বলে মুলুকের পতি আরে ভাই,
আপনার শাস্ত্র বল তবে চিন্তা নাই।
অন্যথা করিবে শাস্তি সব কাজীগণে,
বলিলাম পাছে আর লঘু হবে কেনে।" (বৃ)

হরিদাস যবনাধিপতির নিজ মুখে তাঁহার শেষ সিদ্ধান্তের ইঙ্গিত পাইয়া ক্ষণকাল ধ্যানস্থবৎ রহিলেন। তাঁহার জীবনের চরম পরীক্ষা অথবা জীবন-যজ্ঞের চরম অধ্যায় কাছে আসিয়া পঁহুছিয়াছে, ইহা তিনি তখন বুঝিতে পাইলেন।

সেই বিশাল রাজ-সভায় শত শত যবন কর্ম্মচারী তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। বহিঃস্থ দর্শকদিগের অসংখ্য চক্ষুও তাঁহার দিকে নিপতিত। তিনি চক্ষু তুলিয়া একবার তাহা-দিগের সকলকেই দেখিলেন। সশস্ত্র দণ্ড-পুরুষেরা চারি দিকে ভয়ঙ্কর বেশে, ভয়ঙ্কর ভঙ্গিতে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তাহাদিগের প্রতিও তিনি একবার দৃষ্টিপাত করিলেন। কিন্তু, বোধ হয় এই বিপত্তির সময়ে তাঁহার দৃষ্টি ধীরে ধীরে পৃথি-বীর ধূলিরাশি অতিক্রম করিয়া একটুকু ঊর্দ্ধে উঠিল। বোধ হয় সে ঊর্দ্ধতন অলক্ষিত জগতে একখানি অপূর্ব্ব-সুন্দর, স্নিগ্ধ-মধুর, ভুবন-মোহন অভয়-মূর্ত্তি সে সময়ে তাঁহার মানস-নেত্রে প্রতিবিম্বিত হইল। তিনি সেই দিকেই তাঁহার চক্ষু দু'টি রাখিয়া এবং সভার সমস্ত ব্যক্তিরই হৃদয়ে বিস্ময় জন্মাইয়া বলিয়া উঠিলেন,—ঈশ্বর যাহা করিবেন, তাহাই হইবে; তাঁহার বিচার ভিন্ন মনুষ্যের বিচারে কাহারও কিছু হই-বার নহে।

"হরিদাস বলেন, যা করেন ঈশ্বরে,
তাহা বহি আর কেহ করিতে না পারে।" (বৃ)

হরিদাস চিরকালই দীনের দীন, দম্ভশূন্য, কাঙ্গাল ভক্ত। ইতিহাস যে সকল মহাপুরুষদিগকে ভক্তবীর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে, হরিদাসের সহিত তাঁহাদিগের কোন অংশেও সাদৃশ্য ছিল না। কেন না, হরিদাস জ্ঞানী হইয়াও, জ্ঞান-

হীন শিশুর ন্যায়, সকলের মুখ-প্রেক্ষী রহিতে ভাল বাসিতেন, এবং গুরুস্থানীয় যোগী হইয়াও সকলের দিকে শিষ্যের ভাবে চাহিয়া থাকিতেন। আজি সেই কুসুম-কোমল শিশুর প্রাণে সহসা একটা মহাশক্তি সঞ্চারিত হইল—শিশির-সিক্ত কোমল কুসুম সহসা বজ্রাগ্নি উদ্গিরণ করিতে লাগিল। যিনি কখনও উচ্চকণ্ঠে কথাটি কহিতে জানিতেন না, তিনি বীরের কণ্ঠে, বীর-রসের প্রত্যক্ষ অবতারের ন্যায় বলিয়া উঠিলেন,—

"খণ্ড খণ্ড যদি হই,—যায় দেহ প্রাণ,
তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম।" (বৃ)

হরিদাসের এ কথা গুলি কালের পাষাণফলকে চিরকালের জন্য দৃঢ় মুদ্রিত হইয়া রহিল,—পৃথিবীর যেখানে যে কোন মনুষ্য ভক্তির সহিত ভগবানের নাম লইতেছিল, কথা কয়টি সেই খানেই তাহার হৃদয়ে গিয়া প্রতিধ্বনিত হইল।—

"খণ্ড খণ্ড যদি হই,—যায় দেহ প্রাণ,
তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম।"

যবনাধিপতি হরিদাসের অশ্রুত-পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন, বিস্মিতের অধিক এ বার একটুকু বেশী মাত্রায় ক্রুদ্ধ হইলেন। এখন তিনি একপ্রকার নিরুপায়। এখন আর তিনি কাজীগণকে উপেক্ষা করিয়া চলিতে

পারেন না। কারণ, তিনি "অপরাধীর" দ্বারা, প্রকাশ্য দরবারে, সহস্র লোকের চক্ষের উপরে, তৃণের মত উপেক্ষিত ও অসম্মানিত হইয়াছেন। তিনি কাজীদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ক্রোধ-রুদ্ধ কম্পিত-স্বরে বলিলেন,—"এই ব্যক্তির সম্পর্কে তোমরা এক্ষণ কি ব্যবস্থা করিতে ইচ্ছা কর?"

"শুনিয়া তাহার বাক্য [illegible]কের পতি,
জিজ্ঞাসিলা এবে [illegible] ইহার প্রতি।" (বৃ).

গোড়াই কাজী তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া বলিল,—এখন আর বিচারের কথা কি? পাইকেরা ইহাকে বান্ধিয়া লইয়া রাজধানীর বাইশ বাজার বেড়িয়া বেড়াইবে, এবং প্রত্যেক বাজারে ইহাকে বেত্রাঘাত করিয়া, ইহার প্রাণদণ্ড করিবে। যদি এই ব্যক্তি ক্রমে ক্রমে বাইশ বাজারে বেত খাইয়াও জীবিত রহে, তবে বুঝিব যে ইহার কথা সত্য।

"কাজী বলে বাইশ বাজারে বেড়ি মারি,
প্রাণ লহ, আর কিছু বিচার না করি।
বাইশ বাজারে মারিলেও যদি জীয়ে,
তবে জানি ইহ সব সাচা কহে।
পাইক সকলে ডাকি তর্জ্জন করি কহে,
এমত মারিবে যেন প্রাণ নাহি রহে।
যবন হইয়া যেই হিন্দুয়ানী করে,
প্রাণান্ত হইলে শেষে এ পাপেতে তরে।" (বৃ)

যবনাধিপতি এই আজ্ঞাই অনুমোদন করিলেন; এবং

বঙ্গে প্রেম-ভক্তির প্রথম পথ-প্রদর্শক,—বঙ্গীয় ভক্তিবিপ্লবের পূর্ব্বনায়ক, পর-দুঃখ-কাতর পবিত্রমূর্ত্তি হরিদাস, তৎক্ষণাৎই কতক গুলি ভয়ানক পাইকের হস্তে বন্দী হইয়া, সেই বিচার-সভা হইতে বহিষ্কারিত হইলেন।

"পাপীর বচনে সেই পাপী আজ্ঞা দিল,
দুষ্টগণে আসি হরিদাসেরে ধরিল।" (বৃ)

রাজা যে রূপ আজ্ঞা করিলেন, রাজকিঙ্কর দণ্ডপুরুষেরা কড়ায় ক্রান্তিতে ঠিক সেইরূপ অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হইল। তাঁহারা হরিদাস ঠাকুরকে হাতে ও গলায় বাঁধিয়া, বাজারে বাজারে ঘুরাইয়া, তাঁহার তপঃক্লিষ্ট কাতর শরীরের উপর অসুরের মত বেত্রাঘাত করিতে লাগিল। যে পৃথিবীতে শত শত পিশাচ ও পাপিষ্ঠ, কপটতার ক্রূর-কৌশলে, শক্তি ও সম্পদের সমুচ্চ আসনে আরূঢ় হইয়া, সোনার থালে ভাত খাইতেছে,—আত্মসুখের জ্বলন্ত আগুনে অনন্ত লোকের সুখ-শান্তিকে আহুতিস্বরূপ ঢালিয়া দিতেছে, আপনার নিষ্ঠুর নীচাশয়তাকে সুসজ্জিত শোভন-বেশে প্রদর্শন করিবার জন্য শত শত লোকের স্বত্ব ও স্বাধীনতার উপর দিয়া শকটে চড়িয়া চলিয়া যাইতেছে, হায়! সেই পৃথিবীতে হরিদাসের মত সাধু, হরিদাসের মত সরল, সুশীল, প্রেম-বিহ্বল পুণ্যশ্লোক ভক্ত এই রূপ অসহ্য আঘাত ও অকথ্য অপমান ভোগ করিতে বাধ্য হইলেন! এ কাহিনী

কোন্ প্রাণে সবিস্তরে লিখিব? কেমন করিয়া পাঠককে সবিস্তরে বুঝাইব?

প্রত্যেক বাজারেরই দুই কাতারে পিপীলিকার জাঙ্গা-লের মত লোকের ভিড়। পাইকেরা ঠাকুর হরিদাসকে সেই ভিড়ের মধ্য দিয়া বেত মারিতে মারিতে লইয়া যাইতেছে; আর যে দেখিতেছে সে-ই আর্ত্তনাদ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতেছে। কেহ বলিতেছে, রাজার সর্ব্বনাশ হইবে; কেহ বলিতেছে, এ রাজ্য ছারেখারে যাইবে। কেহ আকুল প্রাণে কাঁদিয়া কাঁদিয়া পাইকদিগকে সম্ভাষণ করিয়া বলি-তেছে, "ভাই! তোমরা এই মহাপুরুষকে ছাড়িয়া দিয়া আমায় মার,—আমার এই পাপ-দেহে বেত্রাঘাত কর।" কেহ ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া চীৎকার করিয়া বলিতেছে, "ধর্, ধর্, এই পাপিষ্ঠ পাইকদিগকে সকলে মিলিয়া শক্ত হাতে ধর্।" কেহ পাইকদিগের পায়ে পড়িয়া কাকুতি করিতেছে, কেহ তাহাদিগকে অর্থ দিয়া বশ করিবার চেষ্টা পাইতেছে। লোকের মনে সেখানে তখন দুঃখ, ক্রোধ, আতঙ্ক ও অন্তর্দ্দা-হের কেমন এক ভয়ঙ্কর তুফান উঠিয়াছে, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। শত সহস্র চক্ষে দর দর অশ্রুধারা, শত সহস্র কণ্ঠে হায় হায় ও হাহাকার ধ্বনি! কিন্তু নিষ্ঠুর ও পাপিষ্ঠের প্রকৃতি জগতের সকল স্থলে এবং সকল সময়েই সমান;—"পাষাণে নাস্তি কর্দ্দমং।" সকল লোক 'হাহা-

কার করিতেছে, পাইকেরা সেই হাহাকারের প্রত্যুত্তরে অসুর ও পিশাচের ন্যায় খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতেছে এবং বেত চালাইতেছে।—

"তথাপিও দয়া নাহি জন্মে পাপিগণে,
বাজারে বাজারে মারে মহা ক্রোধ মনে।" (বৃ)

আর ঠাকুর হরিদাস? তিনি তখন কি অবস্থায়? এইরূপ তদ্গতচিত্ত, তন্ময়ভাবাপন্ন মহাপুরুষদিগের পরীক্ষা ও প্রেমোৎসর্গের মহাশিক্ষা আমাদিগের মত সাধারণ মনুষ্যের বুদ্ধির অগম্য। বুল্ বুল্ ও দয়েল, খঞ্জনের নৃত্য বুঝিতে পারে,—খগেন্দ্রের মেঘস্পর্শিনী ঊর্দ্ধগতি কোন মতেই বুঝিতে পারে না। পাইকেরা মারিতেছে, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা শোকাকুলের মত বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছে; কিন্তু হরিদাস ধীর, স্থির, প্রশান্ত ও অটল।

"কৃষ্ণ কৃষ্ণ স্মরণ করেন হরিদাস,
নামানন্দে দেহে দুঃখ না হয় প্রকাশ।

* * *

কৃষ্ণের প্রসাদে হরিদাসের শরীরে,
অল্প দুঃখ না জন্মায় এতেক প্রহারে।
অসুর প্রহারে যেন প্রহ্লাদ-বিগ্রহে,
কোন দুঃখ না পাইল সর্ব্বশাস্ত্রে কহে।
এই মত যবনের অশেষ প্রহারে,
দুঃখ না জন্মায় হরিদাস ঠাকুরেরে।" (বৃ)

হরিদাসের শরীর তখন দুঃখস্পর্শের অনধিগম্য। যেন কেহ তাঁহাকে কোলে করিয়া বসিয়া আছে,—যেন কেহ ছায়া রূপে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া আপনার সুখ-শীতল সূক্ষ্মতনু দিয়া তাঁহার তনু খানি ঢাকিয়া রাখিয়াছে। যেন কেহ মায়ের প্রাণে তাঁহার প্রাণটাকে আবরিয়া রাখিয়া তাঁহার সমস্ত দুঃখ শুষিয়া লইতেছে, এবং তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে অমৃত ঢালিয়া তাঁহাকে শীতল রাখিতেছে। শরীরের উপর দিয়া এত হইয়া যাইতেছে, মুখখানি তথাপি প্রফুল্ল এবং মৃদুহাস্যযুক্ত। সে জগদ্দুর্লভ মূর্ত্তি দেখিয়া যবন পাই-কেরাও বিস্মিত।—

"বিস্মিত হইয়া ভাবে সকল যবনে,
মনুষ্যের প্রাণ কি রহয়ে এ মারণে।
দুই তিন বাজারে মারিলে লোক মরে,
বাইশ বাজারে মারিলাম যে ইহারে।
মরেও না আরো দেখি হাসে ক্ষণে ক্ষণে,
এ পুরুষ পীর বা সবেই ভাবে মনে।" (বৃ)

এ নিদারুণ প্রহারের সময়ে, ভাবাবেশের অনির্ব্বচনীয় ক্ষমতায়, হরিদাসের আত্মসম্পর্কে দুঃখ হইল না বটে, কিন্তু তাঁহার প্রেমময় পবিত্র প্রাণ পরের ভাবনায় আর্দ্র হইল,—পরের জন্য কাঁদিল। এ কথাও অবশ্যই আমাদের বুদ্ধির অগম্য। তবে ইহার এক বিশেষ প্রামাণিকতা এই যে, ঠিক

এমনই আর একটি কথা পৃথিবীর ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে, এবং সে কথা গুলি, উনিশটি শতাব্দী পার হইয়া, আজও লোকের কণ্ঠে কণ্ঠে, দেশে দেশে উচ্চারিত ও আলোচিত হইতেছে। প্রায় উনিশ শত বৎসর পূর্ব্বে, এসিয়ার সুদূর পশ্চিম প্রান্তে, কোন মহাত্মা কিংবা মনুষ্যদেহধারী মহাদেবতা, প্রাণান্তকর বিপত্তির সময়েও আপনার কষ্টে ক্লিষ্ট না হইয়া,—আপনার ভাবনা না ভাবিয়া, যাহারা তাঁহার প্রাণের উপর আঘাত করিতেছিল, তাহাদিগের ভাবনা ভাবিয়াছিলেন,—তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। শুধু ইহাই নহে, তাহাদিগের জন্য ভগবানের কাছে এই বলিয়া প্রার্থনা করিয়াছিলেন,—

"পিতা তুমি এই অবোধদিগের সকল অপরাধ ক্ষমা কর। কারণ, ইহারা কি করিতেছে, তাহা ইহারা জানে না।"

এসিয়ার দক্ষিণ প্রান্তে,—ভারতের পুণ্য ক্ষেত্রে—ঠাকুর হরিদাসও ঠিক সেই প্রাণে, সেই প্রেমে, সেইরূপ অচল বিশ্বাসে এবং ভক্তির অপার্থিব উচ্ছ্বাসে, তাদৃশ আসন্ন মৃত্যুর সময়ে, তাঁহার প্রাণারাধ্য হরির নিকট প্রার্থনা করিলেন,—

"এসব জীবেরে প্রভু করহ প্রসাদ,
মোর দ্রোহে নহু এ সবার অপরাধ।" (বৃ)

এই প্রার্থনাই ভগবানের অনন্ত প্রেমে ভক্তের সম্পূর্ণ

আত্মোৎসর্গ,—ইহাই ভক্ত হরিদাসের জীবন-ব্রত-রূপ মহা-যজ্ঞের পূর্ণাহুতি। এরূপ ঘটনা ও এইরূপ প্রার্থনা জগতে নিত্য হয় না। কিন্তু যখন হয়, তখন পৃথিবীতে কেমন এক প্রকার স্বর্গীয় সমীর প্রবাহিত হইতে থাকে, লতা তখন আনন্দে দোলে,—পাদপ অজ্ঞাতসারে পুষ্পাঞ্জলি দেয়, মেঘ মধু বর্ষে, সূর্য্যের জ্যোতি স্নিগ্ধ ভাব ধারণ করে,—শিশু সুগভীর নিদ্রার মধ্যেও মায়ের কোলে চক্ষু বুজিয়া হাসে, বিহঙ্গের কণ্ঠে উলুলুর মত আনন্দনিঃস্বন হইতে রহে, এবং মনুষ্যের ধর্ম্মে ও কর্ম্মে, বাহিরের ও অভ্যন্তরের জীবনে, একটা যুগান্তর উপস্থিত হইয়া পড়ে।

হরিদাসের প্রার্থনা শুনিয়া পাইকেরা স্তম্ভিত হইল। তাহারা হরিদাস ঠাকুরকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "এখন আমরা করিব কি? আমরা ইহা বুঝিয়াছি, তুমি মরিবে না,—তুমি মরিবার লোক নও। তোমার প্রাণ এত প্রহারেও যখন বাহির হইল না, তখন বুঝিয়াছি উহা আমাদিগের কাছে বাহির হইবে না। কিন্তু তুমি প্রাণে না মরিলে, কাজী আমাদিগের সকলেরই প্রাণদণ্ড করিবে। এ অবস্থায় এখন আমাদের উপায় কি?"

তখন ঠাকুর হরিদাস তাহাদিগের মুখের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিলেন,—"ভাই! তোমরা কেহই ভীত হইও না। আমি মরিলেই যদি তোমাদিগের মঙ্গল এবং প্রাণরক্ষার

কারণ হয়, তাহা হইলে এই দেখ, এখনই আমি মরিতেছি।” হরিদাস এই বলিয়া ধ্যানের আবেশে যোগ-মগ্ন হইলেন। তাঁহার সেই যোগ-সিদ্ধ শরীরে নিঃশ্বাস ও প্রশ্বাসের গতি-রোধ হইল। যবন পাইকেরা তাঁহাকে নিস্পন্দ, নিশ্চেষ্ট ও মৃত স্থির করিয়া যবনাধিপতির প্রাসাদের দ্বারে নিয়া ফেলিয়া দিল।—

“হাসিয়া বলেন হরিদাস মহাশয়,
আমি জীলে তোমা সবার যদি মন্দ হয়।
তবে আমি মরি এই দেখ বিদ্যমান,
এত বলি আবিষ্ট হইলা করি ধ্যান।
সর্ব্ব-শক্তি-সমন্বিত প্রভু হরিদাস,
হইলেন আবিষ্ট কোথাও নাহি শ্বাস।
দেখিয়া যবনগণ বিস্ময় হইলা,
মুলুক-পতির দ্বারে লইয়া ফেলিলা।” (বৃ)

হরিদাস ইচ্ছামৃত্যুতে অধিকারী ছিলেন, এমন কথা নহে। কিন্তু যোগীরা যখন ইচ্ছা করেন, তখনই তাঁহাদি-গের দেহে মৃত্যুর এই রূপ প্রতিকৃতি পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। যিনি প্রতিদিন তিন লক্ষ হরিনাম জপ করিতেন, তাদৃশ মহাযোগীর পক্ষে এই রূপ আত্মরোধ অথবা মহা-সমাধির অবস্থা নিতান্তই অসম্ভব কি?

যবনাধিপতি হরিদাসকে মৃত জানিয়া তাঁহাকে মাটী দেওয়ার আদেশ করিলেন। সেই অদ্ভুতচরিত্র গোড়াই কাজী

ম্নতের প্রতিও বিদ্বেষের বিষ পুষিত। সে উঠিয়া হুঙ্কার করিয়া বলিল,—"এ পাপাত্মাকে মাটী দিতে নাই, মাটী দিলে, ইহার আত্মার সদ্গতি হইবে। এ ব্যক্তি যখন যবনের বড় ঘরে জন্মিয়াও এইরূপ নীচ-কর্ম্ম করিয়াছে, তখন ইহাকে পরকালেও নীচে রাখা উচিত। ইহাকে এই হেতু, মাটী না দিয়া, গাঙ্গে ভাসাইয়া দেওয়াই সর্ব্বতোভাবে সুসঙ্গত।

"মাটী লঞা দেহ বলে মুলুকের পতি,
কাজী কহে তবে ত পাইবে ভাল গতি।
বড় হই যেন করিলেক নীচ কর্ম্ম,
অতএব ইহারে জুয়ায় সেই ধর্ম্ম।
মাটী দিলে পরকালে হইবেক ভাল,
গাঙ্গে ফেল যেন দুঃখ পায় চিরকাল।
কাজীর বচনে সব ধরিয়া যবনে,
গাঙ্গে ফেলাইতে সবে তোলে গিয়া তানে।" (বৃ)

হরিদাসের সম্পর্কে পূর্ব্বাপরই কাজীর ব্যবস্থা, রাজার ব্যবস্থা হইতেও প্রবল হইয়াছিল। এক্ষণও তাহাই হইল। পাইকেরা হরিদাসকে তুলিয়া লইয়া গাঙ্গে ভাসাইয়া দিল। কিছু ক্ষণ পরে নগরের সর্ব্বত্র জনরব হইল যে, হরিদাস এখনও জীবিত আছেন; এবং তিনি গাঙ্গের তটে বসিয়া হরিনাম কীর্ত্তন করিতেছেন।

"হেন মতে হরিদাস ভাসেন গঙ্গাতে,
ক্ষণে হৈল বাহ্যজ্ঞান ঈশ্বর ইচ্ছাতে।

চৈতন্য পাইয়া হরিদাস মহাশয়,
তীরে আসি উঠিলেন পরানন্দময়।” (বৃ)

যখন হরিদাসের পুনর্জ্জীবন-সংবাদ চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইল, তখন তাঁহাকে দেখিবার জন্য ঐ প্রদেশের ছোট বড় সমস্ত লোকই ক্ষিপ্তের মত ছুটিল। যবনেশ্বর স্বয়ংও গঙ্গার তটে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। হরিদাস তাঁহাকে দেখিয়া একটুকু হাসিলেন। যবনাধিপতি তখন সসম্ভ্রমে দুইটি হাত যোড় করিয়া হরিদাসকে বলিলেন,—

“আমি এতক্ষণে ইহা জানিলাম যে, তুমি সত্য সত্যই মহা পীর। কারণ, জগদীশ্বরকে তুমি এক এবং অদ্বিতীয় বলিয়া খাটি জানিয়াছ। যাহারা পৃথিবীতে যোগী ও জ্ঞানী বলিয়া ভাণ করে, তাহাদিগের মুখের কথামাত্র সার। কিন্তু তুমি প্রকৃতই সিদ্ধি লাভ করিয়া সিদ্ধপুরুষ হইয়াছ। আমি তোমাকে দেখিবার জন্যই এত দূরে এখানে আসিয়াছি। তুমি মহাশয় ব্যক্তি। তোমার শত্রু মিত্র নাই; সকলই তোমার সমান। তুমি আমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিবে। আমি যে তোমায় চিনিতে পাই নাই, ইহাতে তুমি চিত্তে ক্ষোভ রাখিও না। তোমায় চিনিতে পারে, এ জগতে এমন ব্যক্তি কে আছে? তুমি এখন গঙ্গাতীরে, নির্জ্জন স্থানে ‘গোফায়’ থাকিয়া তপস্যা কর, অথবা তোমার যেখানে ইচ্ছা, সেখানে চলিয়া যাও, কেহই তোমার কোন

কার্য্যে কিছু বলিতে পারিবে না। তুমি আজি হইতে সর্ব্বতোভাবে স্বাধীন।”—

“কত ক্ষণে বাহ্য জ্ঞান পান হরিদাস
মুলুক-পতিরে চাহি হৈল মহা হাস।
সম্ভ্রমে মুলুক পতি যুড়ি দুই কর,
বলিতে লাগিলা কিছু বিনয় উত্তর।
সত্য সত্য জানিলাম তুমি মহা পীর,
এক জ্ঞান তোমার সে হইয়াছে স্থির।
যোগী জ্ঞানী সব যত মুখে মাত্র বলে।
তুমি সে পাইলা সিদ্ধি মহা কুতূহলে।
তোমারে দেখিতে মুই আইনু এথারে,
সব দোষ মহাশয় ক্ষমিবে আমারে।
সকল তোমার সম, শত্রু মিত্র নাই,
তোমা চিনে হেন জন ত্রিভুবনে নাই।
চল তুমি শুভ কর আপন ইচ্ছায়,
গঙ্গাতীরে থাক গিয়া নির্জ্জন গোফায়।
আপন ইচ্ছায় তুমি থাক যথা তথা,
যে তোমার ইচ্ছা তাই করহ সর্ব্বথা।” (বৃ)

সে স্থানের যবনেরা হরিদাসের অলৌকিক চরিত্র ও অসাধারণ ক্ষমতা দেখিয়া আগেই চমৎকৃত হইয়াছিল। যখন যবনাধিপতি তাহার নিকট যুক্তকরে দাঁড়াইয়া, কাতর-কণ্ঠে ঐ রূপ বিনয় করিলেন, তখন তাহারা সকলেই তাঁহার পায়ে পড়িয়া গেল।

"দেখিয়া অদ্ভুত শক্তি সকল যবন,
সবার খণ্ডিল হিংসা ভাল হৈল মন।
পীর জ্ঞান করি সবে কৈল নমস্কার,
সকল যবনগণ পাইল নিস্তার।" (বৃ)

হরিদাসের মনে পূর্ব্বেও ক্রোধ কিংবা অভিমানের বিকার ছিল না; এখন তাঁহার শত্রুদিগকে পদানত দেখিয়াও, তিনি ক্রোধে কিংবা অভিমানে স্পৃষ্ট হইলেন না। তিনি কখনও কঠোর কথা কহিতে পারিতেন না। যাহারা তাঁহার কাছে আসিয়াছিল, তিনি তাহাদিগের সকলকেই আশীর্ব্বাদ করিলেন, এবং যত-দূর-সম্ভব প্রিয় কথায় পরিতৃপ্ত করিয়া বিদায় দিলেন। বুদ্ধির সাগর গোড়াই কাজীও ক্ষমা চাহিতে আসিয়াছিলেন কি? বোধ হয়—না। ইতিহাসে তাহার উল্লেখ নাই। কিন্তু হরিদাসের দেহ-প্রাণ যেরূপ কোমল বস্তুতে গঠিত হইয়াছিল, তাহাতে ইহা নিশ্চিত যে, গোড়াই কাজী তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে, তাহাকেও তিনি গাঢ় আলিঙ্গনে আদর করিতে পারিতেন।

যবনেরা চলিয়া গেল। হরিদাসও আপনার পথে চলিয়া গেলেন। তিনি যখন হরিনাম গাইতে গাইতে, পুনরায় ভাগীরথীর তট-পথে, ফুলিয়ার অভিমুখে যাত্রা করিলেন, তখন তাঁহার কথা লইয়া দেশের সর্ব্বত্রই দিবারাত্রি অনন্ত প্রকার আলোচনা হইতে লাগিল। দেশের অধিকাংশ

লোকই ভয় ও বিস্ময়ে ভগবানের দিকে চাহিল,—ভগবানের নাম লইল, এবং যবনাধিকৃত ও জীবন্মৃত ভারতের পূর্ব্বপ্রান্তে, ভক্তিধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা অথবা যুগান্তর-প্রারম্ভের কিছু পূর্ব্বেই, ভক্ত হরিদাসের জয় জয় শব্দে, জীবের হৃদয়ে ভক্তির জয় অনুভূত হইল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

সাগর-সঙ্গম।

নদী যেমন সাগরের উদ্দেশে দেশে দেশে ভ্রমণ করে, মনুষ্য-হৃদয়ের সজীব প্রীতি ও সজীব ভক্তিও, সেই প্রকার, নিজ নিজ বিকাশের অনুরূপ ভাব-সাগরে পঁহুছিবার জন্য, কোথাও কঙ্কর-পথের ন্যায় ক্রূরতার বিঘ্ন, কোথাও বা কঠোরতম পর্ব্বত-বর্ত্মের ন্যায় বিপদ-পরম্পরা উল্লঙ্ঘন করিয়া, অতৃপ্ত-তৃষ্ণায় ঘুরিয়া বেড়ায়। নদী, ক্ষীণ-তোয়া হইলে, প্রবলতর স্রোতের আশ্রয় লয়; ক্ষীণ-বলা প্রীতি এবং ক্ষীণ-বলা ভক্তিও প্রবলতর শক্তির অপেক্ষা করিয়া থাকে। যখন পরিশেষে সৌভাগ্যবশতঃ সাগরে যাইয়া সম্মিলিত হয়, তখন নদী সে সুখ-সম্মিলনে আপনারে হারায়; প্রীতি অথবা ভক্তিও, আপনার পৃথক্ অস্তিত্ব হারাইয়া, আর একটা প্রাণে মিশিয়া যায়। ভক্ত হরিদাসও, তদীয় অপূর্ব্ব জীবনের অবসান সময়ে, এই রূপ সাগর-সঙ্গমে আত্মহারা হইয়াছিলেন। সেই কথাটুকুই বলিবার বাকি রহিয়াছে।

ফুলিয়া-সমাজের ব্রাহ্মণাদি ভক্তবৃন্দ হরিদাসের কুশল জানিবার জন্য যার পর নাই উদ্বিগ্ন। সেই যে হরিদাস, যবনাধিপতির পাইক কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া, পাইকের সঙ্গে

চলিয়া গিয়াছেন, সে অবধি, কেহ তাঁহার কোন সংবাদ রাখেন না। তিনি আছেন, না নাই, তাহাও কেহ জানেন না। তিনি বন-মৃগ হইয়া বাঘের মুখে আত্ম-সমর্পণ করিতে গিয়াছেন। আর কি তিনি ফিরিয়া আসিবেন? তখন রেলের রাস্তা নাই, পরিসর রাজপথ নাই এবং এক স্থান হইতে আর এক স্থানে লোকের তাদৃশ যাতায়াত নাই। কেমন করিয়া কে কাহার সংবাদ পাইবে? কিন্তু যদিও কোন সংবাদ পাওয়া যাইতেছে না, তথাপি ফুলিয়ার কেহই তাঁহাকে ভুলিতে পারিতেছেন না।

ভুলিবার কথা নহে। রক্ত মাংসের স্নেহ মমতা পশু-পক্ষীর মধ্যেই বেশী; কিন্তু প্রীতি অথবা ভক্তির আকর্ষণ-জনিত মমতা মনুষ্যেরই বিশেষ সম্পত্তি। ফুলিয়ার অধিকাংশ লোকই প্রীতি ও ভক্তির সুকোমল সূত্রে হরিদাসের সহিত জড়িত হইয়াছিলেন। হরিদাস পিতামাতার ন্যায় তাঁহাদিগের স্নেহকারী, গুরুর ন্যায় তাঁহাদিগের জ্ঞান-দাতা, এবং হৃদয়ের উদারতায় একা এক সহস্র হৃদয়িক সাধুর আশ্রয়-তরু। সে এক জনের অভাবে আজি ফুলিয়া তাঁহা-দিগের নিকট অন্ধকার বোধ হইতেছে। তাঁহারা এই অব-স্থায় আকুলপ্রাণে পথের পানে তাকাইয়া আছেন, এমন সময়ে ঠাকুর হরিদাস, এক দিন, উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম গাইতে গাইতে, অকস্মাৎ তাঁহাদিগের মধ্যে যাইয়া উপস্থিত হইলেন,

এবং তাঁহাকে দেখিয়া সেখানকার সকলেই আনন্দে হরি-ধ্বনি করিতে লাগিলেন।

"যবনেরে কৃপাদৃষ্টি করিয়া প্রকাশ,
ফুলিয়ায় আইলা ঠাকুর হরিদাস।
উচ্চ করি হরিনাম লইতে লইতে,
আইলেন হরিদাস ব্রাহ্মণ সভাতে.
হরিধ্বনি বিপ্রগণ লাগিল করিতে।
হরিদাসে দেখি ফুলিয়ার বিপ্রগণ,
সবেই হইলা অতি পরানন্দ মন।" (বৃ)

ফুলিয়া-সমাজের ব্রাহ্মণেরা বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সমাজে চির দিনই ঠাকুরের পদে আসীন। হরিদাস, সে বহুমানাস্পদ ঠাকুরদিগের মধ্যেও, "ঠাকুর হরিদাস" বলিয়া প্রীতি ও ভক্তির অশ্রুসিক্ত পুষ্পাঞ্জলি পাইয়াছিলেন। এই রূপ সম্মান-সম্পদ এক জন অসাধারণ মনুষ্যকেও পরিতৃপ্ত রাখিতে পারে। কিন্তু হরিদাসের প্রাণের তৃষ্ণা, সাগরা-ভিসারিণী ভাগীরথীর ন্যায়, আপনার অদম্য বেগে আপনি উছলিয়া উছলিয়া উঠিতে ছিল। তিনি ফুলিয়ার ঐরূপ অকপট ভক্তি এবং অমায়িক ভালবাসার সুখ-সম্বন্ধ-সত্ত্বেও সেখানে দীর্ঘ কাল রহিতে পারিলেন না। নবদ্বীপের নূতন ভক্তিসভা তাঁহাকে অলক্ষিত ভাবে আকর্ষণ করিতেছিল। যেরূপ আকর্ষণকে পুরাতন যোগীরা জন্মান্তরীণ অনুরাগ-

এবং আধুনিক যোগ-ধর্ম্ম-প্রচারকেরা আত্মার সহিত আত্মার সজাতীয়তা অথবা সমান গ্রামের প্রেম-সম্বন্ধ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাঁহার উপর তাদৃশ কোনরূপ অপ্রত্যক্ষ অথচ অতি প্রবল আকর্ষণের ক্রিয়া হইতেছিল। হরিদাস আকৃষ্ট হইলেন। তিনি তখনকার নীরস ও নিরানন্দ বঙ্গে, হরি-নাম ও কৃষ্ণপ্রেমের পীযূষ-বর্ষণ দ্বারা, প্রাণ জুড়াইবার অভি-লাষে নবদ্বীপে চলিয়া গেলেন। নবদ্বীপের অসহায় ও উপ-হসিত ভক্তবর্গ তাঁহাকে পাইয়া কি রূপ আনন্দিত হইয়া-ছিলেন, তাহা পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে।

"বিষয়েতে মগ্ন জগৎ দেখি হরিদাস,
দুঃখে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ছাড়েন নিঃশ্বাস।
কত দিনে বৈষ্ণব দেখিতে ইচ্ছা করি,
আইলেন হরিদাস নবদ্বীপ-পুরী।
হরিদাসে দেখিয়া সকল ভক্তগণ,
হইলেন অতিশয় পরানন্দ মন।
আচার্য্য গোসাই হরিদাসেরে পাইয়া,
রাখিলেন প্রাণ হৈতে অধিক করিয়া।" (বৃ)

উল্লিখিত ভক্তিসভার সহিত হরিদাসের ঐ রূপ সম্মি-লনের দুই তিন বৎসর পরেই বঙ্গীয় হিন্দুর পুরাতন নবদ্বীপ সহসা নূতন মূর্ত্তি ধারণ করিল। নবদ্বীপের নিদ্রিত প্রাণ, তিন শত বৎসরের দুঃখ-দুঃস্বপ্নময় মোহ-নিদ্রা হইতে, সহসা জাগ্রত হইয়া, শ্বেতোৎপল-বিলসিত সরোবরের ন্যায়, শুভ্র

শত চক্ষু মেলিয়া চাহিল। নিরানন্দ নবদ্বীপ একই সময়ে সহস্র মৃদঙ্গের মধুরনাদে আনন্দে শিহরিল। বহুদিন হইল কএকটি কাতরহৃদয় ভক্ত, চন্দ্রোদয়ের পূর্ব্বে জ্যোৎস্নার পূর্ব্বাভাস দেখিয়া, ঊর্দ্ধ-দৃষ্টিতে উন্মুখ হইয়া ছিলেন। তাঁহাদিগের আশা পূরিল। ভগবান্ অনন্তদেবের অনন্ত বিধানে, নবদ্বীপের গগনে, ভক্তির পূর্ণচন্দ্র প্রমুদিত হইয়া সমগ্র দেশকে জ্যোৎস্নায় ছাঁইল। সে জ্যোৎস্নার মধুমাখা টানে, দেশের প্রাণে, প্রকৃতই একটা মহাসমুদ্র মধুর-ভৈরব গভীর-শব্দে উথলিয়া উঠিল, এবং হরিদাসের প্রাণভরা ভক্তি সে সমুদ্রে মিশিয়া গেল। হরিদাসের পৃথক্ অস্তিত্ব চির-দিনের তরে বিলুপ্ত হইল।

এই পুস্তকে ঠাকুর হরিদাসের জীবনচরিত লিখিতে যত্নপর হই নাই। কারণ, তাঁহার জীবনের কোনরূপ চরিতাখ্যান নাই। তিনি জন্মাবধি জগতের সর্ব্বপ্রকার বিষয়-বন্ধনের বহির্ভূত। সুতরাং তাঁহার জীবনে চরিতাখ্যানের কোনরূপ চারু-ফলিত রম্য চিত্র, অথবা রস-বিচিত্র কথা থাকা সম্ভব নহে। কিন্তু, তদীয় পবিত্র জীবন, ভক্তির অপার্থিব উত্তেজনায়, কেমন একটা আনন্দময় যজ্ঞে পরিণত হইয়াছিল, তাহাই সংক্ষেপে বিবৃত করিয়াছি। সে যজ্ঞের শেষ আহুতি গৌড়েই হইয়া গিয়াছিল। যে সময়ে হরিদাস, পৃষ্ঠে বক্ষে, মুখে মস্তকে, অথবা আপাদ মস্তক সমস্ত দেহে,

শত শত নিষ্ঠুর আঘাত প্রাপ্ত হইয়াও, আপনার মৃত্যু-চিন্তার পরিবর্ত্তে শত্রুর মঙ্গল-চিন্তা করিয়াছিলেন,—যে সময়ে তিনি সর্ব্বাঙ্গে ক্ষত বিক্ষত এবং রুধির-ধারায় পরিপ্লাবিত রহিয়াও, প্রাণান্তক পাপিষ্ঠদিগের পরিত্রাণের জন্য, ভগবানের কাছে কাতরপ্রাণে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাঁহার জীবনের যজ্ঞ সেই সময়েই পূর্ণাহুতিতে সফল হইয়া যজ্ঞেশ্বরে পঁহুছিয়াছিল। সে যজ্ঞানল-সন্দীপিত সুধা-স্নাত প্রাণ, নবদ্বীপে যাইয়া, নয়নাভিরাম গৌরচন্দ্রের ঢল ঢল প্রেমানন্দে শীতল হইল,—প্রবহমাণা নদী সাগর-সঙ্গমের অনির্ব্বচনীয় সুখে বিলয় পাইল।

হরিদাস নবদ্বীপেও অনেক কার্য্য করিয়াছেন। কিন্তু সে সকল কার্য্য তাঁহার নিজের কার্য্য নহে। তিনি সেখানে পুতুলের মত নাচিয়াছেন, পাগলের মত গাইয়াছেন, এবং শতসহস্র হৃদয়ের সহিত সম্মিলিত ভাবে ভক্তির জয়ধ্বনি করিয়া জীবনে কৃতার্থ হইয়াছেন। তিনি তাঁহার চরম সময় নীলাচলে—শ্রীধাম জগন্নাথক্ষেত্রে অতিবাহিত করেন। সেখানে অদ্যাপি তাঁহার সমাধি আছে। দেশ-দেশান্তরের হৃদয়বান্ ভক্তেরা সে সমাধিকে অদ্যাপি অশ্রুধারায় ধৌত করাইয়া থাকেন। হরি-গুণ-মুগ্ধ মহাভক্তের সেই সমাধি স্থান, তাঁহাদিগের অমল চক্ষে,—ভক্তির সমুজ্জ্বল বিজয়স্তম্ভ।

সম্পূর্ণ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তক সকল নিম্ন-
ত স্থানে প্রাপ্তব্য।

ভক্তির জয় (নূতন সংস্করণ) { বিলাতি ধরণে বাঁধাই ... ১॥০ ; কাগজে বাঁধাই ... ১।০ }

প্রমোদ-লহরী (নূতন সংস্করণ) { বিলাতি ধরণে বাঁধাই ১।০ ; কাগজে বাঁধাই ... ১৲ }

প্রভাত-চিন্তা, নূতন সংস্করণ (পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত) ১৲

নিভৃত-চিন্তা " " " ১৲

ভ্রান্তিবিনোদ " ১৲

াঙ্গীত-মঞ্জরী (ভক্তি-রসাত্মক গীতাবলী) ... ।০

(শিশুপাঠ্য পুস্তক)

কোমল কবিতা ৵১০

াদর্শ (দেখিয়া লিখিবার বিবিধ পাঠ, বড় অক্ষরে মুদ্রিত) ৴০

র্ণপাঠ (শিশুদিগের প্রথম শিক্ষার উপযোগী অতি সহজবোধ্য
ও সুখ-পাঠ্য পুস্তক) ... ...

পুস্তক পাইবার ঠিকানা।

কলিকাতা—২০ নং কর্ণওয়ালিশষ্ট্রীট, সংস্কৃত প্রেসডিপজিটরী।
২০১ নং ঐ বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী।
৬৭ নং কলেজষ্ট্রীট ষ্টুডেন্টস্ লাইব্রেরী।
৫৫ নং কলেজষ্ট্রীট ক্যানিং লাইব্রেরী।

াকা—আরমাণিটোলা বান্ধব-কুটীরে, প্রকাশকের নিকট ; এবং
সমস্ত পরিচিত পুস্তকালয়ে।

প্রকাশক—শ্রীহরকুমার বসু।